কিশোর কাহিনী সিরিজ

# অলয় আদিত্যর ইচ্ছাপত্র রহস্য

আশাপূর্ণা দেবী

# অলয় আদিত্যর ইচ্ছাপত্র রহস্য

আশাপূর্ণা দেবী

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : কৃষ্ণেন্দু চাকী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

"বোম্বাইয়ের 'সাগরিকা কুঞ্জ'-র বাসিন্দা বিশিষ্ট বাঙালি ব্যবসায়ী অলয় আদিত্যর আকস্মিক জীবনাবসান। ...মধ্যরাত্রে ঘুমের মধ্যে হৃদরোগে নিঃশব্দ মৃত্যু!"

বেশ বড়-বড় হেডিং দিয়ে খবরটা প্রকাশিত হল—২ আশ্বিন ১৪০১। ইংরেজি ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, সোমবারের সকালে প্রায় প্রতিটি বাংলা-ইংরেজি, মায় কোনও-কোনও হিন্দি দৈনিকেও!

কোনও-কোনও কাগজে হয়তো সংক্ষিপ্তভাবে কেবলমাত্র খবরটুকুই। ...কোনও-কোনও কাগজে হয়তো ঈষৎ বিশদভাবে! কোনও-কোনও কাগজে হয়তো অলয় আদিত্যর ছবি-সহও!

তবে খবর একই!

না, কোনও আততায়ীর হাতে নিহত হননি তিনি! আত্মহত্যার ঘটনাও নয়! নিতান্তই স্বাভাবিক মৃত্যু!

বোম্বাইয়ের বেশ কয়েকজন নামকরা ডাক্তার এসে দেখে গিয়ে একই রায় দিয়ে গেছেন!

"মৃত্যু স্বাভাবিক! আকস্মিক হৃৎপিণ্ডের লাফালাফির ফল!"

তা ছাড়া অস্বাভাবিক মৃত্যুর কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ী মহলে বিশেষ নাম এই অকৃতদার বাঙালিটি ছিলেন অতি সজ্জন, সদালাপী, ভদ্র, পরহিতকারী, আত্মীয়বৎসল, এককথায় অজাতশত্রু।

স্বভাবটিও ছিল খুব খোলামেলা। কেনই বা তিনি তবে রাতারাতি 'নিহত' হতে যাবেন, বা 'সুইসাইড' করতে বসবেন ?

যারা একটু বিশদ লিখেছে, তাদের খবরে প্রকাশ—বাহাত্তর বছরের 'যুবক' এই অলয় আদিত্য ছিলেন অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী এবং চন্দ্র-সূর্যের মতোই নিয়মী !

আগের দিন তিনি সারাদিন নিয়মমাফিক সমস্ত কাজকর্ম সমাধা করে, রাত্রি দশটার সময় স্বাভাবিক খাদ্যগ্রহণ করেছেন। এবং যথারীতি তাঁর সাগরিকা কুঞ্জের চারতলার ফ্ল্যাটে নিজের বেডরুমে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে ঘুমোতে গিয়েছিলেন।

তখনও...

না শারীরিক, না মানসিক কোনও বৈলক্ষণ্য দেখা যায়নি। অন্তত তাঁর চিরকালের 'পুরাতন ভৃত্য' নকুড় তাই রিপোর্ট দিয়েছে।

দরজাটা বন্ধ করার আগে যথারীতি নকুড়ের মাথায় একটি ছোট্ট চাঁটি মেরে বলেছেন, "যাঃ। আজকের মতো তোর 'ডিউটি' শেষ ! এবার নিশ্চিন্দি হয়ে খেতে যা !"

ব্যস !

সেই শেষ !

ভোর পাঁচটায় নকুড় যথানিয়মে কর্তার 'বেড-টি' নিয়ে দরজায় 'নক' করেছে। ...কোনও সাড়া পায়নি !

না পাওয়ায় রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়েছে। কারণ এই নক করা মাত্রই দরজাটা খুলে দেন কর্তা, ইতিমধ্যেই তাঁর ঘরের অ্যাটাচ্‌ড বাথরুমে প্রাভাতিক স্নানপর্ব শেষ করে 'ফ্রেশ' হয়েই সামনে

দাঁড়ান।

উদ্বিগ্ন হলেও নকুড় প্রথমটা ভাবল হয়তো এখনও বাথরুমে!

একটুক্ষণ অপেক্ষা করল!

আবার নক করল!

নো সাড়া, নো শব্দ।

আশ্বিনের সক্কালবেলাই ঘাম ছুটে গেল নকুড়ের।

হাতের ট্রে-টা বারান্দায় পাতা টেবিলের ওপর নামিয়ে কাঁধের ঝাড়ন দিয়ে গলার ঘাম মুছতে-মুছতে, সবে এসে লিফ্‌টম্যানকে বলল, "সাহাবকা ভাতিজাকো বোলাও!"

এই বাড়িরই দোতলার ফ্ল্যাটে অলয় আদিত্যর বড় ভাইপো অচ্যুত আদিত্য সপরিবার বাস করে। কাকারই দাক্ষিণ্যে! অলয় তাঁর 'বিজনেস' দেখাশোনা করতে ভাইপোকে কলকাতার বাড়ি থেকে আনিয়ে রেখেছেন।

সেখানে একান্নবর্তী পরিবারে একখানা মাত্র ঘরের বাস উঠিয়ে অচ্যুত এখানে রাজার হালে আছে!

লিফ্‌টম্যানের মুখে নকুড়ের ডাক শুনেই তার হঠাৎ যেন কেমন ভয় জন্মে গেল।

জানে, এ-সময় কাকা বারান্দায় বসে চা খান। ...পরনে থাকে কেবলমাত্র হাতকাটা গেঞ্জি ও পায়জামা।

কিছুক্ষণ পরে তিনি অন্যের অসাক্ষাতে যোগ-ব্যায়াম করেন।...

তারপর খবরের কাগজ নিয়ে বসেন।

তো সেই সময়ের আগে একমাত্র নকুড় ছাড়া কারও ওই চারতলার ফ্ল্যাটে প্রবেশ অধিকার থাকে না!

অতএব অচ্যুত হন্তদন্ত হয়ে উঠে এসে বলে, "কী ব্যাপার নকুড়?"

নকুড় হতাশভাবে ইশারায় দেখায়—ব্যাপার এই ! কর্তা দরজা খুলছেন না ।

এদিকে টেবিলে রাখা চায়ে তখন সর পড়ে গেছে ।

"দরজা খুলছেন না ?"

"না ।"

"কোনও সাড়া দিচ্ছেন না ?"

"না !"

"হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েননি তো ?"

"জানি না ।"

"দরজায় জোরে ধাক্কা দিয়েছ ?"

নকুড় হঠাৎ হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠে বলে, "আমি কিছু জানি না বড়দাবাবু । এখন আপনি যা করবার করুন !"

বড়দাবাবু আর কী করবেন ? পুলিশে খবর দেওয়া ছাড়া ? সেইসঙ্গে পারিবারিক ডাক্তার অলয় আদিত্যর বন্ধুসম ডাক্তার মুখার্জিকেও ফোন করা ছাড়া ?

ডাক্তার মুখার্জি একটু দূরে থাকেন, তবু খবর শুনেই উদভ্রান্ত হয়ে ছুটে এলেন ।

আর পুলিশমশাইরা ? তাঁরাও খুব দেরি করলেন না । কারণ, কেসটা কোন লোকের, তা দেখতে হবে তো ?

তাঁরা এসেই চটপট তাঁদের প্রাথমিক কাজটি করলেন । অর্থাৎ দরজাটি ভাঙলেন !

কিন্তু ভাঙা মাত্রই ?

তাঁরা কী তাঁদের পূর্ব অভিজ্ঞতামতো ঘরের মধ্যে চোখ ফেলেই আঁতকে উঠে, আর্তনাদ করে পিছিয়ে সরে এলেন ?

সামনেই দেখলেন একটি গলায় ফাঁস লাগানো ঝুলন্ত দেহ ? কিংবা বিছানায় শায়িত একটি রক্তাক্ত কলেবর ?...

অথবা ঘরের মধ্যে প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কির চিহ্নসমেত মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে একখানি দীর্ঘ সুন্দর দেহ।

মোটেই তা নয়। তাঁরা যেন হতভম্ব হয়ে স্থিরনেত্রে ঘরের মধ্যে স্থিরচিত্র দেখতে পান!

ঘরের চেহারা নিথর পাথর।

একধারের একটা জানলা ঈষৎ খোলা, আর মাথার ওপরকার সিলিং ফ্যানটা মাঝারি বেগে একমনে ঘুরে চলেছে। ...সেইটুকু ঘোরার ফলে মাঝে-মাঝে বিছানার চাদরের কোণটা একটু উড়ছে। জানলার পরদাগুলো একটু দুলছে!

আর খাটের ওপর? খাট নয়, পালঙ্কই বলা উচিত। সাবেকি স্টাইলের কাজকরা পালঙ্কের ওপর সাবেকি বাঙালিয়ানা ধরনের বিছানা।

এতকাল বোম্বাইতে বাস করেও—অলয় আদিত্যর বিছানায় দামি চাদরের কোনও ছাপ কখনও পড়েনি।

স্রেফ সাদা ধবধবে চাদর, সাদা ধবধবে ঝালর দেওয়া ওয়াড় পরানো একজোড়া মাথার বালিশ, আর বিছানার দু' পাশে দুটো গাবদা-গোবদা পাশবালিশ। আর পায়ের কাছে গোল্লা-গাল্লা একটি তাকিয়া!

এরই মধ্যে দুধসাদা রং স্যান্ডো গেঞ্জি ও কোঁচানো ধুতি পরা দীর্ঘদেহী অলয় আদিত্য একটি গাবদা পাশবালিশ আঁকড়ে পাশ ফিরে শুয়ে আছেন দরজার দিকেই মুখ করে।

বিছানাতে ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্ন নেই। এমনকী চাদরটা একটু কোঁচকানোও নয়!

ডাক্তার মুখার্জি এগিয়ে এসে আস্তে বললেন, "ন্যাচারাল ডেথ। হার্ট ফেলিওর।" সরে এলেন। তবু, তা হলেও পুলিশ তো তাঁদের কর্তব্য না করে ছাড়বেন না? তাই পাশ ফেরা

মুখটাকে একটু ঘুরিয়ে নিরীক্ষণ করে দেখতে চেষ্টা করলেন। গলায় গলা টিপে ধরার কোনও দাগ আছে কি না।

হতাশ হলেন।

কিন্তু তারপরই হঠাৎ তাকিয়ে দেখলেন বালিশের তলা থেকে কী একটু বেরিয়ে রয়েছে চিকচিকে সোনার মতো! ভাইপোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এটা কী ব্যাপার?"

অচ্যুত সেটা টেনে বার করল, হাতঘড়ির সোনার ব্যান্ড!...

অলয় আদিত্যর বরাবরের অভ্যাস, রাত্রে ঘুমের সময় মাথার বালিশের তলায় হাতঘড়িটা রাখা।

তা চামড়ার ব্যান্ডে হাতে দাগ লাগে বলে ইদানীং রুপো দিয়ে একটা ব্যান্ড গড়িয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু অচ্যুত পরে কাকার এই গত বছরের জন্মদিনে শখ করে সোনার ব্যান্ড গড়িয়ে দিয়েছিল!

দেখে পুলিশ ইনস্পেক্টরের চোখ জ্বলে উঠল, "পিওর গোল্ডের?"

অচ্যুত 'ইয়েস স্যার' বলে তাড়াতাড়ি সেটা পকেটে পুরে ফেলে।

চোর আর পুলিশ দু'জন সম্পর্কেই একই মনোভাব আসে। সুযোগ পেলেই এরা সোনাটোনা খপ করে বাগিয়ে নিয়ে বসে।

কিন্তু ততক্ষণে প্রধান পুলিশ সাহেবের চোখ দুটো গোল্লা হয়ে উঠেছে আরও একটা জিনিসের আবিষ্কারে।

তিনি 'হুম' বলে প্রায় লাফিয়ে ওঠেন।

এই তো পাওয়া গেছে!

হুম!

কিন্তু কী সেই জিনিসটি?

বিশেষ কিছুই নয়। একটুকরো সাদা কাগজে কয়েক লাইন লেখা। তার তলায় অলয় আদিত্যর হাতের স্বাক্ষর ও তারিখ!

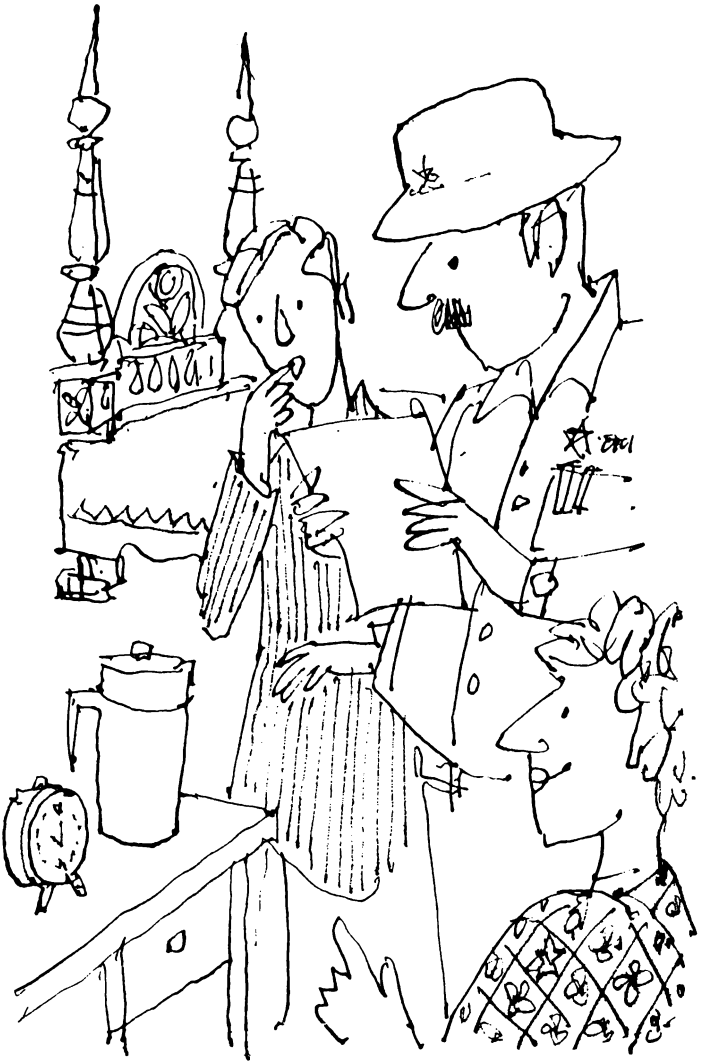

আর কে পায় তাঁকে ?

"এই তো পাওয়া গেছে সুইসাইড নোট !"

"সুইসাইড নোট ?"

অচ্যুত এগিয়ে এসে কাগজটা নিতে চায়, তিনি সহজে হাতছাড়া করতে চান না।

অচ্যুত তবুও চেষ্টা করে দেখে চোখ বুলিয়ে বলে, "কে বলেছে সুইসাইড নোট ? ...এ তো এক ধরনের ইয়ে প্রার্থনা মন্ত্র গোছের !"

"প্রার্থনা মন্ত্র !"

কথাবার্তা অবশ্য ইংরেজিতেই হচ্ছে ! কারণ সাহেব তো মহারাষ্ট্রীয়। ...তবে লেখাটা তো বাংলা। তাঁর বোধগম্য ভাষা নয়।

তা হলেও তিনি যেভাবে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন, তাতে মনে হল 'বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাতে এসো না !'

তারপর কাগজটা নিজের হাতেই রেখে বললেন, "আচ্ছা, আমায় তর্জমা করে শোনাও তো।"

"এ জিনিস এত চটপট তর্জমা করা যাবে না স্যার। আপনার মাথাতেও ঢুকবে না। তবে যদি চান তো এর দু-চারটে জেরক্স কপি নিয়ে যান। ...থানায় নিয়ে গিয়ে কোনও বাঙালি নবিশকে দিয়ে বুঝে নেবেন।"

সাহেব ঘোরতর আপত্তিতে মাথা নেড়ে বলেন, তাঁর অত সময় নেই। ওসব জেরক্স কপিটপি যা করবার তিনিই করিয়ে নেবেন। আপাতত, তিনি এই বস্তুটি হাতছাড়া করবেন না !

কিন্তু অলয় আদিত্যর ভাইপো অচ্যুত আদিত্যও কম লোক নয়। সে দৃঢ়ভাবে বলে, "কিন্তু আমিও তো এটি হাতছাড়া করতে রাজি নই। আমার একান্ত প্রিয় আত্মীয়জনের শেষ হস্তাক্ষর।

...কোনও চিন্তা করবেন না। দেরি হবে না। দু' মিনিটের মধ্যেই এর দু-চার শিট জেরক্স কপি পেয়ে যাবেন !

তারপর নকুড়ের দিকে তাকিয়ে বলে, "নকুড়, কাকার অফিসঘরটা খুলে চট করে কয়েকটা জেরক্স কপি করে দিতে পারবি ?"

নকুড় তো একমনে ঝাড়নের কোণে চোখ মুছে চলেছিল, ওই ব্যাটা পুলিশ অফিসার দু'জনের ধমক খাওয়ার ভয়ে একবারও 'কর্তাবাবুগো' বলে ডুকরে উঠতে পারেনি।

এখন কান্না চাপা গলায় বলে, "পারব না কেন ? যখন-তখনই তো করি।"

আসলে—অলয় আদিত্যর নিজের অফিসঘরে একটা জেরক্স মেশিন আছে। দরকারমতো ব্যবহার করতেন। কাজের সুবিধের জন্য নকুড়কে তার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

অচ্যুত পুলিশকে বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা। অতএব তাঁরা বাধ্য হয়ে কাগজটি হাতছাড়া করলেন।

নকুড় চলে যেতেই সাহেব বললেন, "এই লোক কে ?"

অচ্যুত বলল, "আমার কাকার, অর্থাৎ ওই সদ্যমৃত ব্যক্তির সবচেয়ে কাছের লোক, বিশ্বাসী, পুরাতন কাজের লোকটি। সবসময় তাঁর সেবায় নিযুক্ত থাকে।"

"হুম। খাওয়াদাওয়াও এর হাতে ?"

"নিশ্চয়ই। গত রাত্রেও এর হাতেই খেয়েছিলেন।"

অচ্যুত তীব্রভাবে বলে, "কেবলমাত্র গত রাত্রেই কেন, ওর সারাজীবন আর ওর প্রভুর সারাজীবন, সমস্ত দিনরাত্রি সকালসন্ধ্যার যে কোনও সময়ের খাওয়াদাওয়াই ওর হাতে। এমনকী অসুখ করলে ওষুধ পর্যন্ত।"

অচ্যুতের এই রুদ্রমূর্তি দেখে সাহেব একটু গুম হয়ে কী বলতে

যাচ্ছিলেন !

ইতিমধ্যে নকুড় কাগজটার কয়েকটা জেরক্স কপি করে এনে ধরে দেয়।

সাহেব 'আসল' আর 'কপি' দুটোকে ভাল করে মিলিয়ে দেখতে থাকেন।

নকুড় হঠাৎ বলে ওঠে, "অত দেখছ কী সাহেব ? বাংলা বোঝো ?"

"কেয়া বোলতা হ্যায় ?"

অচ্যুতের দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেন সাহেব, "কেয়া বোলতা ইয়ে আদমি ?"

"ও কিছু না ! আপনি স্যার এগুলো নিয়ে যান, আপনার দফতরের কোনও বাঙালিবাবুকে দেখানগে। সে এই কাগজের মর্মোদ্ধার করে দেবে। তখন বুঝতে পারবেন এটা সুইসাইড নোট নয়।"

সাহেব সেটি পকেটস্থ করে বলেন, "তা হলে আমরা এবার ডেডবডি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করি ?"

"তার মানে ?"

ছিটকে ওঠে, অচ্যুত।

"ডেডবডি তোমরা নিয়ে যাবে মানে ?"

"বাঃ। এটা আমাদের ডিউটি নয় ?"

"হোয়াট ? কাঁহে ? ...পাঁচ-পাঁচজন বিশিষ্ট ডাক্তার রায় দিয়ে গেল, 'স্বাভাবিক মৃত্যু'। বলো তো আরও পঁচিশজন ডাক্তারকে এনে হাজির করতে পারি। ...আমার পরমাত্মীয় প্রিয়জনের ডেডবডি তোমাদের হাতে দেব মানে ? ইতিমধ্যে আমার যেখানে যত আত্মীয় আছে তাদের খবর দেওয়া হয়ে গেছে। যে পারে যত শীঘ্র সম্ভব চলে আসবে। শেষ দেখা দেখতে !...."

কথাটা সত্যি !

অচ্যুতের বউ সুমিতা একবার এখানে এসে কাকার দরজা ভাঙার পরের দৃশ্যটি দেখেই নীচের তলায় নিজের ফ্ল্যাটে চলে গিয়ে একধার থেকে কেঁদে চলেছে, আর যে যেখানে আত্মীয় আছে, তাদের ফোন করে চলেছে।

সাহেব একটু মনোভঙ্গ হয়ে বলেন, "এটা আমাদের ডিউটি।"

"তাই যদি হয় তো যান আপনার ওপরওলার কাছ থেকে অর্ডার নিয়ে আসুন। আর তারপর আমাদের পারিবারিক আইন উপদেষ্টার সঙ্গে কথাবার্তা বলুন।"

এত সব ফ্যাচাং শুনে সাহেব রণে ভঙ্গ দিলেন।

"ঠিক হ্যায়।" বলে হাত থেকে নামানো ব্যাগটিকে হাতে তুললেন।

আর নকুড়টা কিনা এই সময় বলে উঠল, "সাহেবের খুড়ো জ্যাঠা মরলেই বুঝি কাটাছেঁড়া করতে মর্গে পাঠিয়ে দাও ?"

"এই ! দিস আদমী আউর কেয়া বোলতা হ্যায় ?"

"ও কিছু না। সাহেব। প্রভুর এই আকস্মিক মৃত্যুতে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

বলে অচ্যুত সাহেবকে একটা বিদায় অভিবাদন জানালেন।

সাহেবরা তিনজন গট-গট ফট-ফট করতে-করতে লিফ্‌টের দিকে এগিয়ে গেলেন।

নেমে যাওয়ার শব্দ পেয়ে নকুড় বলে উঠল, "আপদরা বিদেয় হয়েছে ?"

"হুঁ।"

"পুলিশগুলো এমন বদ হয় কেন বড়দাবাবু ?"

"সবাই কী বদ হয় নকুড় ? কেউ-কেউ হয়। যেমন অল্প বিদ্যে ভয়ঙ্করী। তেমনই অল্প ক্ষমতা ভয়ঙ্করী ! বুঝলি ?"

"ওঃ। ওই ভয়ঙ্করীদের জন্যে আমি একবারের জন্যে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে পারলুম না গো বড়দাবাবু।" বলেই নকুড় পরিত্রাহী ডুকরে উঠে বলে, "আমাদের এ কী হল বড়দাবাবু ?"

"জানি না নকুড়। আমি এখনও বুঝতে পারছি না কী হয়ে গেল ! মাথা বনবন করে ঘুরছে !"

আদিত্য পরিবারের পুরনো কলকাতার সাবেকি বাড়ি বেনেটোলায় যখন খবরটা এসে পৌঁছল, তখন পরিবারের সকলের মোটামুটি প্রাতরাশের সময় !

একতলার বিরাট দালানের মেঝেয় মস্ত একখানা শীতলপাটি বিছানো, তার ওপরই পরিবারের ছোট-বড় সকলের প্রাতরাশ বা ব্রেকফাস্টের আয়োজন।

এটাই এঁদের পাঁচ পুরুষের 'ট্র্যাডিশন' বা ঐতিহ্য !

এখানে যারা বাস করে, তারা এই ঐতিহ্য মেনে চলে। নেহাত যারা ছিটকে এদিক-ওদিক চলে গেছে, তাদের কথা আলাদা। যেমন অলয় আদিত্য ! তিনি তো বিরাট কৃতী।

তবে অকৃতি অধম যারা এখানেই শিকড় গেড়ে বসে আছে, তারা এই ব্যবস্থার বদলের কথা ভাবতেও পারে না। বাড়ির বউরা যদিবা মনে-মনে একটু ভাবে, ছেলেরা আদৌ নয়।

অতএব— তখন সকালবেলা আটটার সময় আদিত্য-পরিবারের সকলেই প্রায় ওই শীতলপাটিতে সমাসীন। বাদে— 'অদ্ভুত আদিত্য' ! তার পুজোপাঠ সারতে দেরি হয়। সে পরে এসে যোগ

দেয়। সে জন্মাবধিই একটু কম বুদ্ধিসম্পন্ন। লেখাপড়ায় এগোতে পারেনি। পুজো-পাঠ বোঝে। ডাকনাম 'ভুতু'। শীতলপাটির 'টেবিলে' এখন কেউ কেউ বসেছেন তেল নুন মাখা মুড়ি, কাঁচালঙ্কা, বড়-বড় কাঁসার বাটি ভর্তি করে নিয়ে। পাশে কাঁসার ছোট-ছোট রেকাবিতে— বেগুনি, আলুর চপ, খানিকটা হালুয়া।

কারও-কারও সামনে বড় কাঁসার রেকাবিতে গরম-গরম ফুলকো লুচি, বেগুনভাজা, আলুর দম, দুটি করে রসগোল্লা !

কারও-কারও পাতের সামনে খাস্তাভাজা, তিনকোনা পরোটা, আলু-মটরের ঘুগনি, দুটো বড়-বড় কাঁচাগোল্লা, সন্দেশ।

তবে সকলেরই হাতের কাছে মস্ত-মস্ত ফুল কাটা কাচের গেলাসে ধোঁয়া-ওঠা চা।

ছোটদের বিভাগে অবশ্য চা নয়, সদ্য জ্বাল-দেওয়া দুধ। এবং খাবারের পাত্রে, তাদের মায়ের নির্দেশমতো এইসবেরই কিছু। তবে টোস্ট, ডিম, এসবের চিহ্নমাত্র নেই।

যাই হোক, সকলেই মৌজ করে বসে। হঠাৎ দেওয়ালের ধারে রাখা টেলিফোনটা ঝনঝনিয়ে বেজে ওঠে।

বাড়ির সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রাখার জন্য অলয় এটি করিয়ে রেখে গেছেন বহুকাল আগে।

বাবুরা সকলেই খেতে ব্যস্ত। অর্থাৎ অলয় আদিত্যর খুড়তুতো কাকার চার নাতি মলয়, প্রলয়, নিলয়, বিলয় ! এঁরা এই বেনেটোলার পৈতৃক বাড়িরই চির বাসিন্দা।

বাবুরা খেতে ব্যস্ত, কাজেই একজন বউ ফোনটা ধরে। তারপর বলতে থাকে, "হ্যালো, হ্যালো, কে ? বড়দি ? বম্বে থেকে বলছ ? কী বলছ, অ্যাঁ ? অ্যাঁ ? কী বলছ ? ... ওরে বাবা ! ওগো তোমরা কেউ এসে ধরো না। আমি বুঝতে পারছি না কী বলছে

বড়দি। আমার গা কাঁপছে।"

তখন খেতে-খেতেই উঠে আসেন একজন। বলে ওঠেন, "হ্যালো, কে বউদি? কী বলছ? জেঠু নেই? ... আমাদের 'জেঠু!' রাত্তিরে ঘুমের মধ্যে? ... যদি শেষ দেখা দেখতে যাই তো— এক্ষুনি? .. কী বলছ? বড়দা ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের সঙ্গে ব্যবস্থা করে রাখছে, যতজন ইচ্ছে যাই। টিকিট পাওয়ার অসুবিধে হবে না? ... অ্যাঁ নিজেদের কোনও খরচাও লাগবে না? ... ওঃ। তা হলে তো ... বাড়িসুদ্ধু সব্বাই ... মানে জেঠুকে ইয়ে জেঠুর মরদেহটিকে একবার শেষ দেখা দেখতে, কী ভালই না বাসতেন উনি সব্বাইকে! আহা! তা হলে এক্ষুনি যত শিগ্‌গিরই পারি ... আহা বলছ তো রাতে ঘুমের মধ্যে মারা গেছেন। এখন বেলা সাড়ে আটটা। ... তো আমাদের পৌঁছতে-পৌঁছতে ডেডবডি পচে উঠবে না? কী বলছ, পার্লারে রাখা হবে? ... ওঃ আচ্ছা তা হলে তো এই প্রস্তুত হচ্ছি সবাই। আচ্ছা— রাখছি।"

রিসিভারটাকে নামিয়ে রাখে।

এটি ধরেছিল মেজোভাই প্রলয়।

সত্যি বলতে, খবরটা আদ্যোপান্ত শুনে তার চোখে-মুখে যেন পুলক ছিটকোচ্ছিল।

জেঠু মরলেন, সেটা অবশ্য একটা দুঃখের কথা। কিন্তু মানুষ তো মরবেই একদিন। কেউ তো আর 'অমর' বর নিয়ে আসেনি। কোটি-কোটি টাকা রোজগার করলেও— মরণকে আটকানো যায় না।

তা হলে? বাকি সবটাই তো আহ্লাদের।

বরাবর জেঠুর (হ্যাঁ এদের সবাইয়ের কাকা নয়? জেঠুই) বোম্বাইয়ের 'সাগরিকা কুঞ্জ'-র স্বর্গীয় শোভা-সৌন্দর্যের কথা শুনেই এসেছে। কখনও চোখে দেখবার সুযোগ ঘটেনি।

বড়দা-বড়বউদিই সারাজীবন রামরাজত্ব করে চলছে। একধাপ দূর হলেও, তারাও তো অলয় আদিত্যর ভাইপো। তো এখন যদি...হঠাৎ সপরিবার উড়োজাহাজে চেপে সেই সাগরিকা কুঞ্জে হাজির হতে পারার সুযোগ এসে গেল। আহ্লাদ হবে না ?

তবে অবশ্য কণ্ঠে আহ্লাদের চিহ্নটা গোপন করতে হয়। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে প্রলয় আবার তার লুচি, বেগুনভাজার সামনে এসে বসে পড়ে যতটা সম্ভব দুঃখু-দুঃখু মুখ করে বলে, "সবাই তো শুনলে সব ? এখন চটপট তল্পিতল্পা বাঁধো। অবশ্য উড়োজাহাজের ব্যাপার বাক্স, বিছানা চলবে না। তার দরকারও নেই। সেখানে তো অঢেল।"

বলে, আবার গপগপ করে বাকি লুচিগুলো শেষ করায় মন দেয়।

অন্যান্যরাও অবশ্য তাই করে। বড়রা রান্নাঘরে ঢুকে গিয়ে যার-যার রেকাবি নিয়ে বসে পড়ে ! জেঠু মরায় অশৌচ হয়ে পড়ল মনে হচ্ছে। তা এসব তো কোনও অসেধ্য নয় !

কিন্তু একজন এত কাণ্ডর কিছুই টের পায় না। সে হচ্ছে অচ্যুতের ছোট ভাই 'অদ্ভুত' ! ছেলেবেলা থেকেই ছেলেটা একটু জড়বুদ্ধি মতো। লেখাপড়াতেও এগোতে পারেনি। ঝোঁক ছিল সংস্কৃতে, তাই কিছুটা পড়েছে। কাজকর্ম কিছু করে না। বিয়েটিয়েরও প্রশ্ন নেই। সারা সকালটা বাড়ির যে গৃহদেবতা 'রাধাকৃষ্ণ', তাঁর সামনে বসে পুজোপাঠ করে। তারপর সকলের শেষে চা খেয়ে, বাংলা খবরের কাগজখানা নিয়ে বাড়ির সামনে, খোলা রোয়াকে গিয়ে বসে। উত্তর কলকাতার দিকে গলির মধ্যে এখনও এরকম খোলা রোয়াকওলা বাড়ি আছে কিছু-কিছু। বসে থাকে। আর সামনে দিয়ে পথচলতি লোকেদের ডেকে-ডেকে বলতে থাকে, "আজকের খবর দেখেছেন ?"

গলির বাড়ি, পথচলতি সকলেই চেনা। কেউ বাজার করতে ছুটছে, কেউ দুধ আনতে ছুটছে, কেউ-বা নাতি-নাতনিকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তোড়জোড় করছে, পাড়ার 'ভুতোবাবু'-র কথায় কে-বা কান দেয় ?

তাতে কিন্তু 'ভুতো'-র কোনও মান-অপমান নেই !

একসময় ভাত খাওয়ার ডাক পড়লে উঠে এসে খায়। খানিক ঘুমোয়। তারপর উঠে পড়ে বাড়ির বাচ্চাকাচ্চাদের সঙ্গে একটু গালগল্প করে, আবার সান্ধ্য পুজোয় বসে পড়ে ঘন্টাতিনেকের মতো। এই তার সাধারণ দিনের ছবি !

যখন পুজোর ঘরে থাকে, তখন সে একদম বহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। কাজেই এখানের কথাটথা তার কানে পৌঁছয়নি। কিন্তু বাড়ির পুরনো রাঁধনি ঠাকরুনবুড়ি বামুনদি পুজোর ঘরে এসে ভাঙা-ভাঙা কান্না-কান্না গলায় ডাক দেন, "অ, ভুতু খোকা। আর ঠাকুরঘরে বসে ঘণ্টা নাড়া চলবে না বাপ। উঠে এসো ! তোমাদের অশৌচ ঘটেছে। ঠাকুর ছোঁয়া, নাড়া চলবে না। ঘর মোছামুছি আমি পরে করে দেব !"

ভুতু খোকার কানে অবশ্য এত কথা পৌঁছয় না। সে চরণামৃতের বাটিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসতে-আসতে বলে, "কী বামুনদি, চেঁচামেচি করছ কেন ?"

এখন এই চরণামৃতটুকু একফোঁটা-একফোঁটা করে বাড়ির সক্কলের মাথায় ছোঁয়ানো তার কাজ। গঙ্গাজলে দূষণ বলে কেউ আর ইদানীং মুখে দেয় না। অতএব মাথায় ! বামুন ঠাকরুন ডুকরে উঠে বলেন, "চেঁচাচ্ছি কী সাধে বাবা ? তোমাদের যে মহা সর্বনাশ হয়ে গেল ! তোমাদের বোম্বাইয়ের খুড়ো কাল রাতে গত হয়েছেন।"

ভুতু কাউকে সামনে দেখতে না পেয়ে সব চরণামৃতটুকু নিজের

মাথায় ঢেলে হাত বুলোতে-বুলোতে অবাক হয়ে বলে, "কী ? কী হয়েছেন ?"

"গত হয়েছেন গো। মানে মারা গেছেন !"

"অ্যাঁ ? তার মানে ?"

ভুতু প্রায় ছিটকে উঠে বলে, "আমায় না বলে-কয়ে ? গেলেই হল ?"

"আহা, বলবার-কইবার সময় কোথা পেলেন বাবা ? সহজ মানুষ রাতে খাওয়াদাওয়া করে ঘুমিয়েছেন। ঘুমের মধ্যেই সব শেষ !"

হাতের বাটিটা আছড়ে ফেলে দিয়ে ভুতু হঠাৎ দুমদুম করে নিজের বুকে ধাই ধপাধাপ কিল মারতে-মারতে বলতে থাকে, "ওগো, আমি কেন ঘুমের মধ্যে মরলুম না। আমি একটা মিথ্যে-মানুষ। তোমরা আমায় এক্ষুনি উড়োজাহাজে তুলে দিয়ে এসো গো। আমি কাকার মৃতদেহখানাও অন্তত দেখি গে একবার।"

বামুনদি সান্ত্বনার গলায় বলেন, "তোমায় একা কেন বাবা, বাড়িসুদ্ধু সবাইই এক্ষুনি উড়োজাহাজে চাপতে যাচ্ছে, দেখতে যাওয়ার জন্য ! তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে ! এখন একটু কিছু মুখে দিয়ে, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো গে। সময় হলেই ডাকবে ওরা।"

"কী ? একটু কিছু মুখে দিতে হবে ! কাকা মরে গেলেন আর আমি খেতে বসব ?"

বামুনদি এগিয়ে এসে বলেন, "অনেক কিছু তো খেতে বলছি না বাবা। অন্তত ঠাকুরের পেসাদি মিছরির পানাটুকু গলায় ঢেলে নাও। আমি এনে দিচ্ছি !"

ব্যস। আর কী ? ঘরে গিয়ে একমনে কেঁদে চলে ভুতু, "ও

কাকা। কাকাগো।”

তারপর মলয় যখন এসে ডাক দেয়, “এই ভুতো, জামা-জুতো পরে নে। এয়ারপোর্টে যেতে হবে।” তখন চোখ মুছে ওঠে জামা-কাপড় পরে নিয়ে বলে, “জুতো পরব মানে ? এখন জুতো পরতে আছে ?”

মলয় বলে, “আরে বাবা, হাওয়াই চটি। রবারের জিনিস। চামড়ার তো নয়। সবাই পরেছি। ওতে দোষ নেই।”

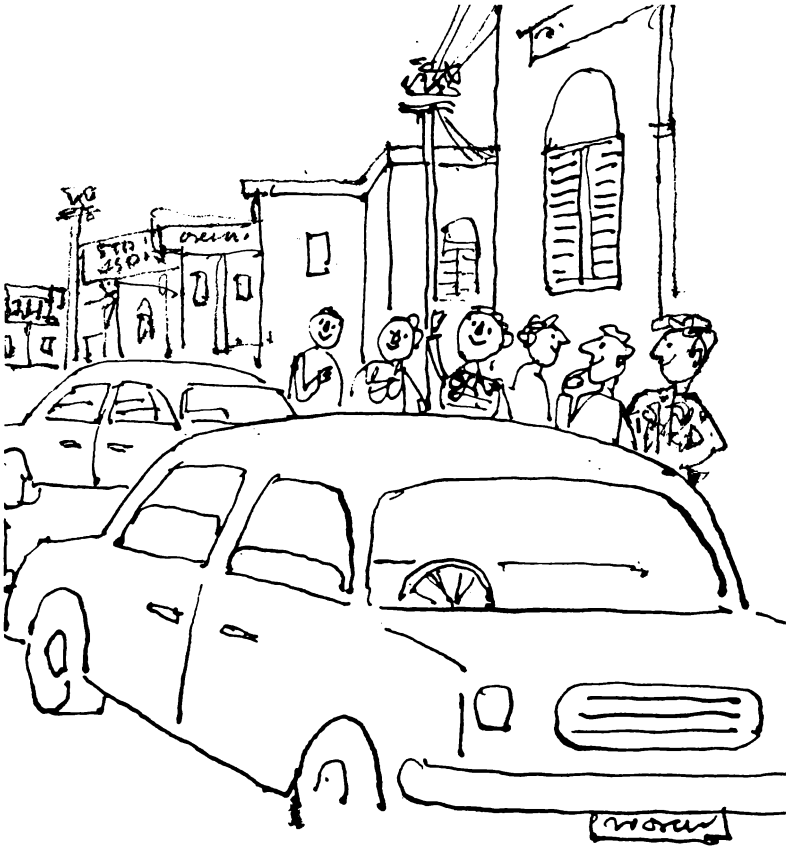

ভুতো গম্ভীরভাবে বলে, "আসলে জুতো ত্যাগ করার কথা নয়। ত্যাগ করার কথা পাদুকা। ... ও তোমার রবারেরও তো 'পাদুকাই'। তো কী আছে? ক'টা দিন পা খালি থাকলে কী ননীর পা গলে যাবে? ... হেঁটে হেঁটে বোম্বাই যেতে হচ্ছে না তো!"

তারপরই বাড়ির সামনে সারি-সারি তিনটে ট্যাক্সি দেখে, এবং তাতে চড়ে বসবার জন্য জনসমাবেশ দেখে, হাঁ করে তাকিয়ে বলে,

"এ তো সবাই বম্বে যাচ্ছে ?"

"যাবে না ? তোমার একার কাকা ? আমাদের জেঠু না ? আমাদের সাধ হয় না শেষ দেখা দেখার !"

"আহা, তা বলছি না। বলছি এতজন যাওয়া হচ্ছে। কাকা নেই, কে আদর-যত্ন করবে।"

"এখন কী এটা আদর-যত্ন খাওয়ার সময় ?"

মলয়, প্রলয়, নিলয়, বিলয়, একসঙ্গে খিঁচিয়ে ওঠে।

ভুতু আর কিছু বলে না। একটা ট্যাক্সিতে উঠে। জানলার ধারে বসে পড়ে রাস্তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে।

উড়োজাহাজ যথানির্দিষ্ট সময়েই ছাড়ে। এবং যথাসময়েই বোম্বাই এয়ারপোর্টে গিয়ে নামে। তারপরই, এই আদিত্যবাহিনীকে নিয়ে যায় অলয় আদিত্যর ব্যবসা সংক্রান্ত বিরাট একটি লাক্সারি বাস ! ... নিতে আসে নকুড়।

আগে থেকেই অচ্যুত আর তার বড় বউ সুমিতা ঠিক করে রেখেছিল, ওই বেনেটোলা কোম্পানিকে, তাদের নিজস্ব দোতলার বিরাট ফ্ল্যাটটা সম্পূর্ণ ছেড়ে দেবে ! তারা তো এখন এই কাকার ফ্লাটেই থাকতে বাধ্য হচ্ছে, নানা দরকার। ... অবশ্য ভুতু তাদের সঙ্গে থাকবে। সে হচ্ছে অচুর নিজের একমাত্র ভাই।

নকুড়ের হেফাজতে তাকে দিয়ে অচু স্বস্তিতে আছে। নীরব ছেলেটা কখন খেলো কখন শুলো কেউ লক্ষ করেনি।

তা দোতলার ওই ফ্ল্যাটটিও বিরাট বইকী ! তিনখানা বেডরুম, একখানা গেস্টরুম, একটা বক্সরুম, প্রকাণ্ড ডাইনিং স্পেস, দু-দুটো বাথরুম। দুটো বারান্দা, তা ছাড়া কিচেন, স্টোর। এ কী সোজা ? .. বেনেটোলা কোম্পানি যেভাবে বসবাস করে তার পক্ষে এ তো রাজসই ব্যাপার !

নকুড় ওঁদের সব দেখিয়ে-শুনিয়ে দিয়ে বলে গেল, "আপনারা

একটু ফ্রেশ হয়ে নিন। জলখাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি!"

তারপর আর কী? 'ফ্রেশ' হয়ে নিয়ে তাঁরা যখন গদিয়ান সোফায় এসে বসলেন, এসে গেল থালা-থালা ফল মিষ্টি ছানা, গেলাস-গেলাস শরবত।

এঁরা তো হতভম্ব!

"এ কী? এত?"

"বড় বউদি বলে দিলেন, সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করুন!"

আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বলে গেল নকুড়। "বড়দাবাবু বলে দিলেন, আপনাদের চার দাদাবাবুর বিশ্রাম করা হবে না। বড়দাবাবুর সঙ্গে বার্নিং ঘাটে যেতে হবে!"

তা দাদাবাবুদের হবে তো হবে। বউদি বাবুদের তো নয়, তাঁরা তাঁদের সাকুল্যে গোটা বারো-চোদ্দ নানা বয়সের বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে আরামের বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

বিছানা এত আরামেরও হয়!

আবার বড়-বড় জোরালো আলোগুলো হঠাৎ নিভে গেল। ঘরের মধ্যে জ্বলে উঠল হালকা নীল আলো। যেন পরির রাজ্য।

কে করল এসব?

এর ব্যবস্থা ঘরের বাইরে থেকেই হয়। যার করবার সে ঠিকমতো সময়ে করে দেয়!

ছোট বউয়ের বড় মেয়েটা তিন বছরের টুম্পা মায়ের গলা ধরে শুয়ে পড়ে চুপিচুপি বলে, "মা, বুড়ো দাদু মরে গিয়ে আমাদের খুব মজা হয়েছে না?"

মা শিউরে উঠে বলে, "এই চুপ, চুপ, খবরদার অমন কথা মুখে আনবি না? বলতে আছে? উনি মারা গেলেন। আমাদের কত দুঃখ হল।"

"ওঃ, দুঃখু।"

মেয়েটা আর-একটু নড়েচড়ে মাথার বালিশটা লোফালুফি করে বলে, "এইখানেই থেকে যাব আমরা। আর সেই পচা বাড়িটায় ফিরে যাব না। ... এখানে কী চমৎকার বাগান। তুমি যদি দেখতে মা! রোজ আমরা ওই বাগানে খেলা করব, কেমন!"

মা বলে, "আচ্ছা! আচ্ছা এখন ঘুমোও তো! কত রাত হয়েছে দেখছ!"

মেয়েটা অবশ্যই ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের ঘোরে ওই গোলাপ বাগানে ঘুরে বেড়ায়।

তাদের বেনেপুকুরের গলির মধ্যে ফুলগাছ তো দূরস্থান, একটা আগাছাও জন্মায় না।

আর তিনটি মা, তাদের ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে চুপিচুপি কিছুক্ষণ কিছু কথা বলে ঘুমিয়ে পড়ে।

আর বাবুরা? অর্থাৎ, মলয়, প্রলয়, নিলয়, বিলয়?

তাদের তো চলে আসতে হয়েছে বড়দার কাছে। জেঠুর সৎকার সম্পর্কে ব্যবস্থা জানতে।

বেনেটোলা কোম্পানিকে, নিজেদের ফ্ল্যাটে পাঠিয়ে দিয়েই সুনীতা অচ্যুতকে বলে ওঠে, "এতজন যে আসবেন, তা ভাবিইনি। সে যাক। এসেছেন ভালই কিন্তু কী একখানা দারুণ ভুল হয়ে গেছে। আসল লোকটিকেই খবর দেওয়া হয়ে ওঠেনি!"

অচু বলল, "আসল লোক !"

"কেন, কাকার প্রাণের পিসি নিত্যলীনা দেবী ! তিনিই তো কাকার সব। একদম সমবয়সী এই পিসিটি যেমন ছেলেবেলার খেলার সাথী ছিলেন কাকার, তেমনই একাধারে গার্জেন। গুরু, প্রেরণা, কী নয় ? আর তাঁর কথাই কিনা ভুলে যাওয়া হল !"

অচ্যুত বলল, "ভুলে যাব কী বলো ? যে-মুহূর্তে পুলিশে দরজা ভাঙল—তারপরই ভেতরের দৃশ্যটি দেখে ব্যাপার বুঝে ফেলেছিলাম, সেই মুহূর্তে তো ও-ঘরে সরে গিয়ে, পিস্‌দিদার হরিদ্বারের গুরুধাম আশ্রমে ফোন করেছিলাম। তো ওই আশ্রমের ভাইস প্রেসিডেন্ট মশাই জানালেন, 'নিত্যলীনা দেবী আজ মাস দেড়েক আশ্রমে নেই। কেদার-বদরি হয়ে, গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী-গোমুখী না কোথায়-কোথায় যেন ঘুরছেন। স্থায়ী কোনও ঠিকানা জানা নেই। খবর দেওয়ার উপায় নেই !... তো আশ্রমের অফিসে খবরটা জানিয়ে রাখুন।' তাই জানিয়ে রেখেছি।"

সুনীতা বলল "এই ব্যাপার ? কই, বলোনি তো !"

বলার সময় পেলাম কখন !

"তা বটে ! আহা ! পিস্‌দিদা জানতে পারবেন না ?"

সুনীতা অবশ্য সেই আশ্রমবাসিনীকে কখনও চোখে দেখেনি ! তবে কাকার কাছে গল্প-শুনে শুনে তাঁর আদ্যোপান্ত মুখস্থ !

সময় পেলেই অলয় বলতেন, "বুঝলে বউমা, একেবারে সমবয়সী হলেও—আর ছেলেবেলার আমার একমাত্র বন্ধু আর খেলুড়ি হলেও একটু বড় হতে না হতেই সে একেবারে আমার ধারিকা, বাহিকা, পালিকা। .... সম্পর্কের জোরে কী শাসন। .... 'অ্যাই অলো। রোদে- রোদে ঘুরবি....অ্যাই অলো, পড়া ফাঁকি দিয়ে খেলবি তো তোর কী শাস্তি করি দেখিস !.... সেটা তো

আমাদের সেই বেনেটোলা বাড়ির পরিবেশ। বৃহৎ পরিবার। সারাক্ষণ লোক গিসগিস করছে! তাঁর ভেতর থেকেই পিসি আমায় শাসাত দ্যাখ অলো, তোর মা নেই বলেই তোর জন্যে আমার এত দায়িত্ব। নইলে তো বয়েই যেতো!' কিন্তু এখন তো তা বললে চলবে না!... এবাড়িতে ছোটকাকা মেজোকাকার যেসব অকালকুষ্মাণ্ড বংশধরগুলো আছে। খবরদার তাদের সঙ্গে মিশবি না!... বুঝলে বউমা? আমি বলতাম, 'ওরা তো ভাই, না মিশলে?' পিসি বলত, "ভাই তো মাথা কিনেছে। কেন, তোর নিজের দাদাটা নেই? তার গুণের তুলনা আছে?"

"দাদা কী আমার সমবয়সী?"

"নয়তো নয়। সমবয়সী হলেই সব হল। দাদাকে আদর্শ করবি।

আবার বলতো, "এই বেনেটোলার বাড়িটা যেন আলসে কুঁড়েদের স্বর্গ।...এরা জানে শুধু কোনমতে খেয়ে-পরে দিনগুলো কাটাতে পারলেই হয়ে গেল। তাতেই জীবন সার্থক। তা বাপ-ঠাকুর্দার রেখে যাওয়া এই বাড়ি আর দেশের বাড়ির জমিজমার আয় থেকে। চলেও যায় তো সকলের। নিজেরা যা যৎসামান্য রোজগার করে, সে তো নস্যি!"

সুনীতা অবাক হয়ে দেখত, পিসির কথা উঠলেই কাকা যেন তুবড়ি।

"বুঝলে বউমা, পিসি বলত, 'দ্যাখ অলো, এই পৃথিবীটাকে দেখতে হয়! প্রাণপণে মানুষ হওয়ার চেষ্টা করতে হয়।....হ্যাঁ 'মানুষ' তো হতেই হবে, মানুষের মতো মানুষ। বড়লোক হওয়ারও চেষ্টা করতে হবে! টাকা না থাকলে, তুই কারও উপকার করতে পারবি? টাকা না থাকলে, পাঁচজনের সামনে মান্যগণ্য হবি?...টাকা রোজগার করা শুধু নিজের আরাম আয়েস

বিলাসিতার জন্যে নয়। সবাইয়ের জন্যে। তবে নিজেই কী আর হ্যাংলার মতো থাকবি ?...সেখানেও একটু ঐশ্বর্য আড়ম্বর থাকা উচিত।'... তো সেই পিসি তো বারো বছর বয়সেই বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। বাড়িতে আমার কেউ কোথাও নেই। না বন্ধু, না খেলার সঙ্গী !...."

"তা বলব কী, বছর-দুই পরে আবার ফিরে এল বিধবা হয়ে।...ব্যস, তদবধি সংসারের হাল পিসির হাতে। বাবা, দাদা, আমি সবাই তার প্রজা !... তো দাদা তো দিল্লিতে চাকরি করতে গেল। বাবা এতদিনে বিয়ে দিয়ে বসেছেন বড় ছেলের।....হায়, হায়। ক'বছর পরে ফিরে এল দাদা চাকরি ছেড়ে দিয়ে।"

"বউ মারা গেছে। দু-দুটো বাচ্চা সামলায় কে ? বাচ্চা দুটি কে বুঝতে পারছ তো বউমা। তোমার বর এই অচ্যুত, আর তোমার ওই বোকাসোকা দেওর অদ্ভুত, তাদেরও দেখাশোনা করেছে পিসি। তবে ওরা বড় হয়ে উঠতেই বলল, 'নাঃ, আর নয়। আর সংসারের মায়ায় পড়ে থাকা নয়।' অবশ্য ছিল। আমার বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন। তারপরে আর নয়।...সোজা হরিদ্বারে গুরু আশ্রমে।...তো ততদিনে— আমি তো এই বম্বে এসে রীতিমত গুছিয়ে বসেছি।.... দেখেশুনে খুব খুশি পিসি !...তবে গুছিয়ে এসে বসার আগের একটা ঘটনা তোমায় বলি বউমা।"

ব্যবসা করার সাধ, অথচ হাতে নেই একটা পয়সা। পিসি তার গলার একটা মোটা সোনার হার দিয়ে বলল, 'আমি বিধবা মানুষ— হার নিয়ে কী করব ? তুই এটাকে বেচে যদি কিছু সুবিধে করতে পারিস দ্যাখ।'

আমার তো খুবই লজ্জা হচ্ছিল। নিতে যাইনি।...রেগে বলল, 'তার মানে তুই আমায় পর ভাবিস ? ঠিক আছে। জন্মের আড়ি।' শেষে অনেক খোশামোদ করে রাগ ভাঙানো। পিসি

বলল, 'তুই যদি জীবনে সফল হতে পারিস সেটাই হবে আমার মস্ত পাওয়া। আর তোরও পিসির ঋণশোধ। ব্যস।'

সেই পিসি! একবার বলেছিল, 'বলছিস যে, বিয়ে করবি না? বুড়ো হলে তোকে দেখবে কে?' আমি বললাম, কচি খোকা নাকি যে দেখতে হবে?...এই তো দাদা তো বিয়ে করেছিল। বউ থাকল? ছাড়ো ও-কথা। নকুড়ই আমায় দেখবে। তো সত্যি সেই নকুড়ই সারাজীবন দেখাশোনা করে এল।

পিসিকে খবর দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে জেনে সুনীতা স্বস্তি পেল। ততক্ষণে বেনেটোলা কোম্পানির জন্যে খাবারটাবার পাঠানোর ব্যস্ততা!....

মলয়, প্রলয়, নিলয়, বিলয় ডাক পেয়ে— কাকার ফ্ল্যাটে আসতেই অচ্যুত বলল, "এই দ্যাখ। ঠিক করেছি, রাত বারোটার মধ্যেই— সৎকারের ব্যাপারটা সারতে যেতে হবে। কারণ রাত একটা বেজে গেলেই তো, যদিও বিলিতি মতে, তবু একটা তারিখ তো পার হয়ে যায়। তার চেয়ে এখুনিই বেরোতে হবে আমাদের।"

প্রলয় খুব বিজ্ঞের মতো বলে ওঠে, "ঠিক, ঠিক বলেছ বড়দা। জেঠু বাসী মড়া হওয়া পছন্দ করতেন না।"

নকুড় একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল ওই 'প্রলয়দা বাবুর' মুখের দিকে। কলিকাল বলেই বলে বোধহয় ভস্ম হয়ে গেল না প্রলয়। কাজেই দিব্যি আস্ত সুস্থভাবেই বলল, "তা সৎকারের সব ব্যবস্থা ঠিক আছে তো? চন্দনকাঠ, গাওয়া ঘি! কতো মণ চন্দনকাঠ লাগবে? ক'টিন ঘি?"

অচ্যুত গম্ভীরভাবে বলে, "এটা কলকাতা নয় পলু। এখানে ওসব চলে না। বিদ্যুৎ-চুল্লিতেই দাহ হবেন।"

"অ্যাঁ ! আহা। অমন মান্যগণ্য মানুষটার শুধু এখানে মরার শান্তিতে এমন সৎকার হবে !"

অচু আরও গম্ভীরভাবে বলে, "এখন দেশের সব মান্যগণ্য লোকেরই এই ব্যবস্থা চালু। যাব, আর দেরি করা নয়।"

দেরিতে আর কী আছে ? সিঁড়ি নামার কষ্ট পর্যন্ত নেই। লিফট থামল। সামনেই দাঁড়ানো বিরাট দুখানা গাড়ি। যাবে অচু এবং ওই চারভাই এবং নকুড়। মেয়েরা কেউ যাবে না ! 'ভুতুর কথাও ভাবেনি কেউ। সবাই ভেবেছিল সে বোধহয় শরবত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। দেখা গেল 'ভুতু' একখানা গাড়ির মধ্যে ঢুকে আছে জানলার ধারে।

"আরে ? তুই যাবি ?"

"হুঁ।"

"তবে চল !...."

তা সবাই গেল এবং কাজ সমাধা করে ফিরলও। গাড়িতেই ঠিক হল আগামীকাল সকালের প্লেনেই সকলে মিলে কলকাতায় ফিরে যাওয়া হবে। কারণ শ্রাদ্ধকার্যটি হবে অলয়ের পিতৃভিটে বেনেটোলার বাড়িতেই। তা কাজ তো বিরাট। ঁ গঙ্গা মার্কা চিঠি ছাপানো থেকে হাজারখানেক বাড়িতে নেমন্তন্ন করতে যাওয়া। তা ছাড়া পুজোটুজোর ব্যাপারে কতো কী ! একবেলা সময়ও নষ্ট করা হবে না।

এইসব ব্যবস্থার পর শেষ রাতে, স্রেফ ভোর বললেই হয়, সবাই একটু শুয়ে পড়ল।

কিন্তু সুনীতা শুয়ে পড়ল না। তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আহা, কাকার বালিশের তলা থেকে আবিষ্কার করা সেই কাগজের টুকরোটার তো পাঠোদ্ধার হয়নি। পুলিশের লোক যেটাকে 'সুইসাইড নোট' বলে টানাটানি করেছিল। এবং সেই বিশ্বাসেই

তার জেরক্স কপিটা নিয়েও গেছে।

সুনীতা উঠে গিয়ে সেই কাগজটা বের করল। অচুকে ডেকে বলল, "আচ্ছা, এটা তো এখনও পর্যন্ত দেখাই হল না।"

ঘুমে চোখ ভেঙে আসছিল অচুর, তবু কষ্টে চোখ খুলে বলল, "সত্যিই তো। কী আশ্চর্য। মনেই পড়েনি। পড় তো...."

সুনীতা আস্তে আস্তে পড়ে, "এখন ১ আশ্বিনের রাত বারোটা বাজতে মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। শুনতে পাচ্ছি, সেই অমোঘ পদধ্বনি। নিতে আসছেন তাঁরা আমায়। আমার পূর্বপুরুষেরা !....আর মাত্র সাড়ে চার মিনিট....তারপর আমি মিলিত হব তাঁদের সঙ্গে ! ওই তো দরজার কাছে এসে গেল পায়ের শব্দ।"

এই লেখাটা কি লৌকিক ?

অচু বলে, "তুলে রাখো। তবে ভাবছি, কাকার ঘরের নিজস্ব ড্রয়ারটা একবার দেখা দরকার। হয়তো...কাকার নিজস্ব কোনও দরকারি কাগজপত্র আছে।"

সকাল হতেই এসে খুলল ড্রয়ারটা। হ্যাঁ, দরকারি কিছু কাগজপত্রই রয়েছে। যেমন ব্যাঙ্কের পাশবই, কয়েকটি বিমা কোম্পানীর রসিদ। একটি ব্যাঙ্ক লকারের নম্বর ও সুতোয় বাঁধা একটি চাবি। ...চশমার পাওয়ার বদলানোর একটি প্রেসক্রিপশন। কিন্তু একদম নীচে এটি কী ? একটি সিল করা খাম !

সিলটা খুলতেই হল অচুকে। দেখতে হবে ব্যাপারটা কী ?

দেখল কাকার নিজের প্যাডে, নিজের হাতে লেখা কিছু কথা !

অবাক হয়ে দেখে অচু কাকার হাতের বাংলা লেখা এমন মুক্তাক্ষরের মতো ? কাকার হাতের বাংলা লেখা, কোনও লেখা অচু আগে দেখেছে বলে মনে করতে পারে না।

INDEX

ধীরে-ধীরে পড়তে থাকে লেখাটা।

"আমার পূর্বপুরুষরা 'উইল' করা পছন্দ করতেন না। তাঁদের নাকি ধারণা ছিল, উইল করলেই মৃত্যু তরান্বিত হয়। ...তবে অবস্থা উইল করবার মতো ছিল বা কী তাঁদের, নেহাত তো দিন আনি দিন খাই অবস্থা। কিন্তু তাঁদের বংশধর আমি অলয় আদিত্য, ভাগ্যক্রমে প্রভূত সম্পত্তি অর্জন করে ফেলেছি। অথচ আমি অকৃতদার। অতএব নিঃসন্তান। কাজেই এই সম্পত্তি সমূহ উচিতমতো বন্টন ব্যবস্থার জন্য একটি 'ইচ্ছাপত্র' সম্পাদন করে রেখেছি। ...একেবারে পাকাপাকিভাবে রেজিষ্ট্রি করা দলিল। এই ইচ্ছাপত্রের ইংরাজিতে তর্জমা একটি কপি আমার এখানের আইন উপদেষ্টা বিখ্যাত সলিসিটার জি. ডি. সিংহানিয়ার নিকট রক্ষিত আছে। অপর একটি ইংরাজি তর্জমা, আমার কলিকাতার আইন-উপদেষ্টা অ্যাটর্নি শ্রী শঙ্কর মুখার্জির দফতরে জমা আছে।

"আমার স্বহস্ত-লিখিত বাংলা ইচ্ছাপত্রের একটি বাংলা প্রতিলিপি রাখা আছে আমার বেনেটোলার বাড়ির নিকটতম প্রতিবেশী ও হিতৈষী পরামর্শদাতা উকিল শ্রী শশধর ঘোষের নিকট। কারণ আমার আত্মীয়স্বজনেরা সকলেই তেমন ইংরাজি নবিশ নয়। বাংলাভাষাটা তাঁদের সহজে বোধগম্য।

"যাইহোক উক্ত তিন বাড়ির কাছেই নির্দেশ দেওয়া আছে। আমার মৃত্যু ঘটলে তারা যথাযথ ব্যবস্থা করবেন! কাজেই ভবিষ্যতে কোনও অসুবিধে হবে বলে মনে হয়না।

স্বাক্ষর-

শ্রীঅলয় আদিত্য

'তাং' দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু দিন আগের লেখা।

জিনিসটা আবার কাকার ড্রয়ারে রেখে দিয়ে অচু ভাবতে থাকে। আশ্চর্য! এই ব্যাপারটা বিন্দুবিসর্গও সে জানত না।

কাকা তো সব বিষয়েই তার সঙ্গে আলোচনা করতেন, পরামর্শও করতেন !

অবশ্য...উইল জিনিসটা গোপনীয় ব্যাপারই। ....কবে কোনও সময় খেয়াল হয়েছে, এবং সেইমতো কাজ করে রেখেছেন। বুদ্ধিমান হিসেবী মানুষ তো। ..

সুনীতাকে এখন এ বিষয়ে কিছু বলে না অচ্যুত।

সুনীতা তাই একটু পরেই এসে বসে পড়ে বলে, "উঃ, তখন সেই চিরকুটটায় ১ আশ্বিনের রাত বারোটা। পড়ে কী ভয়-ভয়ই করছিল। .. পূর্বপুরুষদের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। তাঁরা ওঁকে নিতে আসছেন। ...আর হলও তো তাই !"

তারপর বলে ওঠে, "কাকা মাঝে-মাঝেই বলতেন, "জানো বউমা, আমার বাবা-ঠাকুর্দা পূর্বপুরুষেরা ১ আশ্বিন রাত বারোটায় মারা গেছেন। ...আমিও তাই যাব।" আমার তো বাপু শুনে গায়ে কাঁটা দিত। তবেও মনে হত একজন বুদ্ধিমান বয়স্ক লোক এমন একটা অলৌকিক ধারণাবদ্ধ কেন ?"

তবে বেশিক্ষণ তো কথাবার্তা চালানোর সময় নয় এটা। এখনই কলকাতায় যাওয়ার তোড়জোড় করতে হবে।

ছোট বউয়ের মেয়ে টুম্পা বিছানায় উঠে বসেই বলে, "মা তোমরা সব কী বলাবলি করছিলে ? আমাদের নাকি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যেতে হবে ?

শুধু শুধু মারলে তুমি আমায় ? কী দোষ করেছি আমি ? দ্যাখো, আমি কলকাতার সেই পচা বাড়িটায় আর যাব না। এরোপ্লেন থেকে লাফিয়ে পড়ব, তারপর ছুটতে-ছুটতে আবার এখানে ফিরে আসব !"

"বাঃ, চমৎকার। এখানে তখন কে থাকবে, আমরা সব্বাই তো চলে যাচ্ছি !"

অতএব আবার ভ্যাঁ ভ্যাঁ ! "তোমরা সবাই পাজী। সবাই বিচ্ছিরি !"

অথচ শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, বেনেটোলার বাড়িতে এসে ঢুকেই টুম্পা হইচই করে ওঠে "ও বামুনদি মাসি, এতদিন তুমি একা ছিলে, তোমার ভয় করছিল না ?"

বামুনদি বলেন, "বুড়ো মানুষের আবার ভয়।"

"ও বামুনদি মাসি তুমি যদি যেতে তো বুঝতে। আর ফিরে আসতেই চাইতে না। কী বাগান, কী সুন্দর বাড়ি।"

আবার তখনই কোথা থেকে যেন নিজের পুতুলের বাক্সটা ঠেলে এনে, তার পুতুল ছেলেমেয়েদের বের করে আদর করতে শুরু করে। "তবে আমার সোনারা, এত দিন তোদের চান করাইনি। দুধ খাওয়াইনি।"

দুটো দিনই তার কাছে 'এত দিন'।

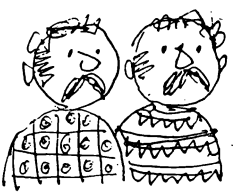

কলকাতায় বেনেটোলার বাড়িতে আসা পর্যন্তই বিরাট কর্মযজ্ঞ চলছে। গঙ্গামার্কা চিঠি ছাপা, হাজারখানেক বাড়িতে গিয়ে-গিয়ে বিলি করে আসা। এ ছাড়াও বাড়িতে পুরোহিত এবং দেশ থেকে আনানো কুলপুরোহিতের সঙ্গে অনবরত পরামর্শ আর ফর্দ তৈরি !

দেখেশুনে প্রলয় বলে না উঠে পারে না, "ও বড়দা, এ যে দেখছি 'রাজসূয় যজ্ঞ' ফাঁদছ। যা দিনকাল, প্রায় লাখ খরচ হয়ে যাবে যে !"

বড়দা গম্ভীরভাবে বলে, "সেই খরচটা তো তোকেও করতে

হবে না, আমাকেও করতে হবে না। কাকা তাঁর পারলৌকিক কাজের জন্যে আলাদা করে এক লাখ টাকা আমার হেফাজতে রেখেই গেছেন কবে থেকে।"

"অ্যাঁ! সত্যিই লাখ! তা বড়দা তিনি রেখে গেছেন বলেই কি এক্ষুনি উড়নচণ্ডীর মতো সব ফুরিয়ে ফেলতে হবে? কিছুটা তো ভবিষ্যতে অন্য কাজে লাগানো যেতে পারে।"

বড়দা আরও গম্ভীরভাবে বলে, "কোন কাজে? আমার শ্রাদ্ধে?"

ব্যস! প্রলয়বাবু একদম চুপ। শুধু ঘরের মধ্যে চার ভাইয়ে অস্থির আলোচনা, "ওরে বাবা, এ তো বাড়াবাড়ি!"

তা এইভাবেই দিন এসে যায়।

শ্রাদ্ধের আগের দিন অচু আর ভুতু দুই ভাই গঙ্গাস্নান করে এসে দালানে বসে দু'জনে দুটো ডাব খাচ্ছে, হঠাৎ সেই সময় এঁদের সাবেকি বাড়ির দরজার পেটেন্ট দুটো বৃহৎ লোহার কড়া ঝনঝনিয়ে বেজে ওঠে!

না, এ-বাড়িতে 'ডোর-বেল' নেই, ওই লোহার কড়া!

একটা ছোট ছেলে, কষ্টে পা উঁচু করে দরজার ছিটকিনিটা খুলে দিয়েই, "ও বাবা" বলে পিছিয়ে পালিয়ে আসে।

"কী রে, ভয় পেয়ে গেলি নাকি?" বলতে-বলতে ভেতরে চলে আসেন এক গেরুয়া থান পরা ন্যাড়া-মাথা সন্ন্যাসিনী! কাঁধে একটা ঝোলা। ঢুকে আসামাত্রই অচু চেঁচিয়ে ওঠে, "পিস্‌দিদা, আপনি এসে গেছেন!"

হ্যাঁ, এদের সকলের মধ্যে একমাত্র অচুই ওই নিত্যলীলা দেবীকে চেনে। বাবার সঙ্গে দু-একবার হরিদ্বার আশ্রমে গিয়েছিল!

'পিস্‌দিদা' শুনেই অবশ্য বাড়িতে যে যেখানে ছিল ছুটে এসে

তাঁর পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়তে আসে ! তিনি বলে ওঠেন, "রয়ে রয়ে। আগে পায়ের জুতোজোড়াটা খুলি ?"

সন্ন্যাসিনী হলে কী হবে, পায়ে একজোড়া ব্রাউনরঙা কেড্‌স।

জুতোজোড়াটা খুলে তিনি হাতে ঝোলানো গঙ্গাজলের বোতল থেকে গঙ্গাজল নিয়ে হাত ধুয়ে সরে এলেন অচুদের কাছে। অচুর তো তখনও হাতের ডাব হাতে !

বাড়ির ছোট ছেলেপুলেরা ছুটোছুটি করে কেউ একটা জলচৌকি, কেউ একটা টুল, কেউ একটা খুরসি পিঁড়ি এনে হাজির করে !

তিনি হেসে-হেসে বলেন, "ব্যস্ত হসনে বাবা ! আমি বসছি।"

বলে কাঁধের ঝোলা থেকে একখানা কম্বলের আসন বের করে পেতে তার ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে বলেন, "ডাবটা খেয়ে নে বাবারা !"

তাড়াতাড়ি খেয়ে নেয় দুই ভাই।

পিসদিদা নির্লিপ্তভাবে বলেন, "গোমুখী গঙ্গোত্রী সেরে, আশ্রমে ফিরেই দেখি এই সংবাদ। চলে এলাম সঙ্গে-সঙ্গে ! জানি তো, এখানেই সবাই একত্র হবি !"

তারপর একটি গভীর নিশ্বাস ফেলে বলেন, "তা হলে 'অলো'ই ১লা আশ্বিনের ধারাটা রাখল ?"

"১লা আশ্বিন ! আপনি জানেন ?" অচ্যুত বলে ওঠে।

নিত্যলীলা দেবী বলেন, "আমি জানব না, তুই জানবি ? বলি তোদের এই বেনেটোলার বাড়িতে অর্ধেকটা জীবন কাটিয়ে যায়নি এই বুড়ি ? একে-একে চার পুরুষ ধরে চলছে এই নিয়ম। বাড়ির তখনকার যে হেড তারই ডাক আসবে ওই পয়লা আশ্বিন। রাত বারোটা, তবে সবাই কিন্তু আর একই বয়সে নয়। আর একই রোগেও নয়। তবে দিনক্ষণটা এক ! ১ আশ্বিন রাত বারোটা।

....আদিকর্তা 'অনন্ত আদিত্য' গেলেন সন্ন্যাস রোগে। ওই ১ আশ্বিন রাত বারোটা। তাঁর ছেলে 'অফুরন্ত আদিত্য' হঠাৎ এক ভুতুড়ে জ্বরে। ...কাছারিবাড়ি থেকে ফিরলেন শীতে হিহি করে ঠকঠক করে জ্বরে কাঁপতে-কাঁপতে। ব্যস। তার ছেলে অক্ষয় আদিত্য দু' ঘণ্টার ভেদবমিতে। তো তাঁর ছেলে! অব্যয় আদিত্যরও তাই যাওয়ার কথা! অব্যয় মানে 'অবু'! এই অবু ভুতুর বাপ! ....কিন্তু সে বেটা অদিনে অকালে দিনদুপুরে গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে মরে বসল, ছেলেদুটোকে ছোট ভাই অলয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে। তো এখন দেখছি পূর্বপুরুষের ধারা ওই অলোই রাখল! এখন ধারাটা মুছে গেলেই ভাল।"

একটি বউ বলে ওঠে, "পিসদিদা, আপনার এত মুখস্থ আছে? পরপর সব বলে গেলেন!"

"তা থাকবে না? ইতিহাস ভূগোল মুখস্থ করে ইস্কুলের পড়া করিনি বলে কি আর মাথার মধ্যে মগজ বলে কিছু নেই?"

"কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যাপারের রহস্য কী বলুন তো? ওই পয়লা আশ্বিন।"

"রহস্য?"

নিত্যলীলা দেবী কপালে একটা জোড়হাত ঠেকিয়ে বলেন, "ভগবানের লীলার রহস্য বুঝি এমন সাধ্য? এই যে 'ফুল যে আসে দিনে দিনে, বিনা রেখার পথটি চিনে'—এর রহস্য কী বল? আকাশে মেঘ ডাকলে কাদায় পড়ে থাকা ব্যাং কেন আহ্লাদে ঘ্যাঙোর-ঘ্যাঙোর করে ওঠে, আবার বনের ময়ূররা পেখম মেলে নাচতে থাকে। এর রহস্য কী? কখনও ভগবানের ঘরে ভূত জন্মায়, আবার কখনও ভূতের ঘরে ভগবান জন্মায়—এর রহস্য কী? যাকগে বাবা! ওসব রহস্যকথা! মানুষ নিজেরাই কত আগডুম বাগডুম রহস্য সৃষ্টি করছে। তা তোদের কাউকেই তো

তেমন চিনছি না। চিনবই বা কী করে ? দেখলুম কবে ! তবে এই চারটি ষণ্ডা মার্কা ও-বাড়ির ছোড়দার নাতি চারটে না ? ...মলয় প্রলয় নিলয় বিলয়।"

'ষণ্ডামার্কা' কথাটা অবশ্য শুনতে খুব মধুর লাগল না ওদের। তবু একটি বউ বলে ওঠে, "হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো। আপনি সকলের নাম জানেন ?"

"আরে বাবা, নামগুলো যে এই বুড়িরই রাখা। তা তোরাই বুঝি এদের বউ, ছেলেপুলে ? ভাল, ভাল ! তবু বংশবৃদ্ধি। অলোটা তো সংসারই করল না। আর অচুটার তো এখনও পর্যন্ত কোনও বাচ্চাকাচ্চাই হল না। ভুতুর কথা বাদ। যাকগে যা হওয়ার হবে। তা তোরা সব ভাল থাকিস। সুখে থাকিস ! চলি তা হলে।"

চলি তা হলে ! এ কী কথা !

সমবেত কণ্ঠে প্রায় আর্তনাদ ! "আজ যাবে নাকি ? আগামীকাল আদ্যশ্রাদ্ধ—"

নিত্যলীলা দেবী হেসে ফেলে বলেন, "আমার আবার আদ্য, মধ্য ! আমি কী তোদের এই আদিত্যবংশের কেউ ? কবেই তো গোত্তরছাড়া করে বিদেয় করে দিয়েছিল। তা ছাড়া এখনকার কথা তো আলাদা।"

"কিন্তু তাই বলে নিজের পিতৃভিটেয় এসে কিছু মুখে না দিয়ে চলে যাবেন ?"

"মুখে ? তো আমার সঙ্গে এই বোতলে হরিদ্বারের গঙ্গাজল। তাই একটু মুখে দিই।"

অচু প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, "তা হতে পারে না। অন্তত একটা ডাব খান। কাকার আত্মা তা না হলে শান্তি পাবে না !"

"বলছিস ? তবে দে, একটা ডাবই দে। আছে আর ?"

"অনেক !"

ছুটে নিয়ে এল একজন একটা।

নিত্যলীলা দেবী সেটাকে গঙ্গাজলে ধুয়ে, আর সামনে পড়ে থাকা কাটারিখানাকেও গঙ্গাজল ছিটিয়ে ধুয়ে বলেন, "কাট তবে।"

অতঃপর ডাবটি শেষ করে, সক্কলকে আশীর্বাদ করে বলে যান, "দ্যাখ অচু, এখনই আমি হরিদ্বারে ফিরে যাচ্ছি না। কিছুদিন বেনারস আশ্রমে থাকব। ছোট মহারাজ এখন বেনারসেই রয়েছেন।"

"বেনারসে ? পিস্‌দিদা। তা হলে কাকার ইচ্ছাপত্র পড়ার দিন আপনি চলে আসতে পারবেন না ?"

"কাকার ইচ্ছাপত্র ? মানে উইল ? তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক রে দাদা ! ও তোদের ব্যাপার। তবে যদি পারি হরিদ্বারে ফেরার আগে, একবার এই বেনেটোলার বাড়িটায় ঘুরে যেতে পারি। যতই হোক জন্মভিটে। তবে যদি পারি। আচ্ছা...।"

আবার কেড্‌সে পা ঢুকিয়ে ঝোলাটাকে বাগিয়ে কাঁধে তুলে নিয়ে গটগট করে চলে যান নিত্যলীলা দেবী। অর্থাৎ অলয় আদিত্যর সেই আশৈশবের খেলার সঙ্গী, বন্ধু, গুরু, উপদেষ্টা 'প্রাণের পিসি' !

হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে সকলে।

অতঃপর 'রাজসূয় যজ্ঞ' মিটল। পাড়ার লোকের কাছে একটা চিরস্থায়ী স্মৃতি হয়ে রইল, শ্রাদ্ধে ঘটাফটা কাকে বলে।

এবার অচু, ভুতু আর অচুর বউয়ের বম্বে যাওয়ার দিন এগিয়ে আসে। ...আর কতদিন সেখানের কাজকর্ম ফেলে থাকা যায় ? কাকার সমগ্র বিজনেসের দেখাশোনার কাজই তো ছিল অচুর।

তবে সে ছিল মালিকের নীচেয় বসে তাঁর সহকারী হিসেবে,

আর এখন মাথার ওপর থেকে ছাতা সরে গেছে।

কী আর করা ? ফিরে যেতে তো হবেই তাড়াতাড়ি।

কাজেই পরামর্শ হল। একটা শান্ত নির্ঝঞ্ঝাট দিন স্থির করা হোক অলয় আদিত্যর 'ইচ্ছাপত্র' পাঠ করার।

তা এরও দিনক্ষণ দেখা দরকার বইকী !

'ইচ্ছাপত্র পাঠ' ব্যাপারটা হচ্ছে একটু গোপনীয়। বাইরের বাজে লোক হঠাৎ এসে পড়ে না ডিসটার্ব করে ! সেটা দেখা

দরকার। ...বাড়ির কাজ-করা লোকজনেরা হঠাৎ না ঢুকে পড়ে, তাও দেখতে হবে।

কাজেই ঠিক হল একটা ছুটির বিকেলে দোতলার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে যারা কেবলমাত্র সম্পত্তির বৈধ অধিকারী বলে গণ্য, তারাই সে-ঘরে থাকবে।

অচ্যুত যখন ডাকল, "মলয়, প্রলয়, নিলয়, বিলয় তোরাও চলে আয় দোতলায়।" তখন চার ভাইয়ের চার জোড়া দাঁতের পাটি কান পর্যন্ত ছুঁয়ে গেল। তারাও যে 'বৈধ অধিকারী'র দলে গণ্য

হবে, এমন আশা তো ছিল না। হিসেবমতো তো তারা পাঁচ পুরুষের জ্ঞাতি। আর সম্পত্তিটা তো পিতৃপুরুষের নয়! অলয় আদিত্যর সম্পূর্ণ স্বোপার্জিত। তবু বড়দা যখন ডেকেছে তখন বুকটা আহ্লাদে উথলে ওঠে!

আস্তে-আস্তে দোতলায় সেই মাঝখানের নির্জন বড় ঘরটিতে উঠে এল ওরা।

এই ঘরটির আজ সাজসজ্জা একটু অন্য ধরনের করা হয়েছে। ঘরের মেজে জুড়ে শতরঞ্চি-চাদর পাতা! তার মাঝখানে একটি জলচৌকি। অনেকটা মঠ মন্দিরের পাঠক ঠাকুরদের মতো!

সেই চৌকিটা ঘিরে বসেছে শ্রোতারা!

উৎকর্ণ, উৎকণ্ঠিত!

একসময় প্রলয় ভুরু কুঁচকে, ইশারায় প্রশ্ন করল, "বড়দা এখানে নকুড় কেন?"

বড়দা ইশারায় জানালেন, "ও থাকবে।"

এদের চিন্তা। 'কেন রে বাবা। ওই কাজের লোকটাও কিছু পাবে নাকি!'

যাই হোক, ব্যাপারটা দু' প্রস্থ হল। প্রথমে ওই ফরাসের ওপরই একপাশে একটি টেবিল-চেয়ার রাখা হল, যেখানে এসে বসলেন অ্যাটর্নি শঙ্কর মুখার্জি! তিনি একটু কেসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ইচ্ছাপত্রের ইংরেজি তর্জমাটি গড়গড় করে পড়ে গেলেন।

কিন্তু উপস্থিত যারা রয়েছে কারও অমন চোস্ত ইংরিজি বোঝবার ক্ষমতা নেই।

তা কী আর করা?

তিনি পড়লেন। গুটিয়ে নিয়ে নিজের অ্যাটাচিতে ভরে সেই নির্জন ঘরটি থেকে বেরিয়ে এসে নীচে নেমে এলেন।

সেখানে অবশ্য তাঁর 'আপ্যায়ন' ব্যবস্থা মজুত ছিল প্রচুর। বাড়ির মহিলারা ঘোমটা দিয়েই পরিপাটি খাওয়ালেন।

তিনি চলে গেলেন।

তারপর শুরু হল পাড়ার চিরকালের উকিল শশধর ঘোষের 'পাঠ'।

সকলের বোধগম্য পরিষ্কার বাংলায় লেখা সেই দলিলটি। ইচ্ছাপত্রটি তাঁর ব্যাগ থেকে বের করে, বিছিয়ে ধরলেন সেই জলচৌকিটার ওপর।

এবার তো সকলেই প্রায় হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে। কারণ ইনি আবার একটু চিবিয়ে-চিবিয়ে কথা বলেন।

তিনি একবার কেসে, কাছে রাখা জলভর্তি গেলাসের জল থেকে একঢোক খেয়ে ইচ্ছাপত্রটি কপালে ঠেকিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ইশারায় বললেন, "ওরা ?"

অচু তাকিয়ে দেখল বুড়ি বামুনদি আর বাড়ির নিত্যসেবার ঠাকুরমশাই !

অচু ইশারায় বলল, "ওরাও থাকবে।"

"আর ওরা ? ওই ডাকাত-মার্কা একদম এক চেহারার দুটো লোক।"

অচুর ইশারা, "ওরাও থাকবে।"

"দুটো এক ছাঁচের কেন ?"

এইরকমই।

শশধর এ-বাড়ির চিরকালের চেনা ! এদের কখনও দেখেছেন বলে মনে পড়ল না !

তো এখন তো আর ডাক-হাঁক দিয়ে পরিচয় জানতে যাওয়া যায় না।

সন্দেহ-সন্দেহ চোখে বেশ কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে দেখে ঘরের

বাইরে বারান্দার দিকে তাকালেন।

"ও কী ? ওটা কে রেলিংয়ের কাছ দিয়ে চলে গেল ফস করে ? সাদা জামা পরা।"

অচু একটু হেসে বলে, "সাদা জামা পরা লোক নয় একটা গাবদাগোবদা সাদা বেড়াল।"

"তা হোক। তাড়াও ওটাকে। বেড়ালেরও কান আছে।"

তাড়াতে অবশ্য হল না। সে নিজেই চলে গেল, এল ঘরের বারান্দার রেলিং থেকে, অন্য ঘরের বারান্দার রেলিংয়ে। তা হোক সাবধানের মার নেই !

বারান্দার দরজাটাও বন্ধ করে দেওয়া হল।

শশধর ঘোষ চশমাটা নাকে ভাল করে সেঁটে জলচৌকির ওপর পাতা ইচ্ছাপত্রটির ওপর ঝুঁকে পড়লেন।

শশধর ঘোষের গলার স্বরটি একটু ভাবগম্ভীর শোনাল। আস্তে একটু গলা ঝেড়ে শুরু করলেন, "আমি শ্রীঅলয় আদিত্য (নিবাস... বর্তমান ঠিকানা...) অদ্য তাং.... সম্পূর্ণ সজ্ঞানে সুস্থ অবস্থায়, কাহারও বিনা প্ররোচনায় নিজ বুদ্ধি বিবেচনা ও বিবেকমতো এই ইচ্ছাপত্রটি রচনা করিতেছি।

ইচ্ছা নং ১—

"আমার এই সারাজীবনের পরিশ্রমে গড়া বোম্বাইয়ের যাবতীয় ব্যবসাবাণিজ্য, এবং এই 'সাগরিকা কুঞ্জ ভবন' ও নিজস্ব প্রয়োজনের এবং কোম্পানির প্রয়োজনে যে তিনখানি গাড়ি আছে,

এই সমস্তকিছুর—আমার অবর্তমানে একমাত্র মালিক হইবেন আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান অচ্যুত আদিত্য ! যিনি এ-যাবৎ বিশ্বস্ততায় ও নিষ্ঠায় আমার ডানহাত স্বরূপ হইয়া আমার সহকারী হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন। এই সমগ্র সম্পত্তি তিনি দান বিক্রয় অধিকার-সহ পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিবেন। যদিও এখনও তাঁহার কোনও সন্তানাদি হয় নাই, তবে ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই এই ব্যবস্থা !"

শশধর একটু থামেন।

ঘরের মধ্যে গোটা চার-পাঁচ বুক ধড়ফড়িয়ে ফেটে যেতে থাকে। ..ওঃ। এই লোকটা, অচ্যুত আদিত্য, কী লগ্নেই জন্মেছিল ! অ্যাঁ ? মুফতে একটা সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে গেল !

যদিও অলয়ের মৃত্যু ঘটলে, অচ্যুতই যে তাঁর সর্বেসর্বার মালিক হবে, এটা অবধারিতই ছিল।

এ ছাড়া আর কী হতে পারে ?

কিন্তু ভবিষ্যতে 'পাবে' এটা একটা কথা। 'এইমাত্র পেয়ে গেল' সেটা আর-এক কথা !

শশধর একটু নস্যি নিলেন।

তারপর আবার পড়তে লাগলেন, "তবে শ্রীমান অচ্যুতের উপর একটি শর্ত আরোপ করা হইল—সে যেন আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান অদ্ভুত আদিত্য ওরফে 'ভুতু' অচ্যুতের একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা, যাবজ্জীবেৎ সেই 'ভুতু'কে নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়া দেখাশোনা করে। জন্মাবধি ঈষৎ জড়বুদ্ধিসম্পন্ন এই ভুতুকে সম্পত্তির অংশ দেওয়ার কোনও অর্থ হয় না তাই এই ব্যবস্থা করিতেছি !

"আমি শ্রীমান অচুর উপর যথেষ্ট বিশ্বাস রাখি, কাজেই জানি সে সানন্দে তাহার কর্তব্য করিবে !"

অতঃপর—

ইচ্ছা নম্বর ২...

শশধর চারদিক তাকিয়ে বলেন, "আলোটা জ্বেলে দিলে হত না ?"

"তা বলতে পারেন। যদিও বাইরে এখনও আলোয় ভেসে যাচ্ছে। তবে দরজা-জানলা বন্ধ পরদা-ফেলা ঘরের মধ্যে আলো-আঁধারি।

তাড়াতাড়ি কেউ একটা আলো জ্বেলে দিল। পাখার স্পিডটা একটু বাড়িয়ে দিল।

শশধর একটু কাশলেন।

কাছে রাখা জলের গ্লাসটা থেকে এক ঢোক জল খেলেন। তারপর আবার পাঠ করতে থাকেন !

এখন নগদ টাকার কথায় আসা যাক।

"ব্যবসাবাণিজ্য ব্যতীতও বোম্বাইয়ের নানা ব্যাঙ্কে ও কলিকাতারও দু-একটি ব্যাঙ্কে দীর্ঘমেয়াদি, বা স্বল্পমেয়াদি, নানাবিধ প্রকল্পে, এবং বিমা ইত্যাদিতে যে টাকা মজুত আছে, তাহা কম-বেশি দুই কোটি টাকা হইবে।"

ওই টাকার সম্পূর্ণ অর্ধাংশের অধিকারিণী হইবেন হরিদ্বার 'গুরুধাম' আশ্রমবাসিনী, আমার একমাত্র পিসি—শ্রীমতী নিত্যলীলা দেবী। তিনি—"

কিন্তু সবটা কি পড়ে উঠতে পারলেন শশধর ঘোষ ?

কী করে পারবেন ? যদি হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা বোমা এসে পড়ে ? আর সেই বোমার ধাক্কায় বসে থাকা জনেরা কেউ-কেউ ছিটকে উঠে আর্তনাদ করে ওঠে। "কী ? কী ? দুই কোটি টাকার অর্ধাংশ মানে এক কোটি কে পাবেন ? ...নিত্যলীলা দেবী ? সেই মাথা-ন্যাড়া গেরুয়া থান-পরা গঙ্গাজল-খেগো বুড়িটা ? ...এ কী

মামদোবাজী না কী ? ...ওই বুড়ি ওই টাকাগুলো গুনতে পারবে ? ...করবেটা কী নিয়ে ?"

শশধর ঘোষ, চশমাটা নাকে আর একটু সেঁটে নিয়ে বলেন, "দ্যাখো, বাপু, প্রথমেই বলে রেখেছি, 'ইচ্ছাপত্র' পাঠের সময় যেন কেউ ডিসটার্ব না করে। অথচ তোমরা ? এটা কী ? তোমাদের যা-কিছু রিমার্ক পাশ করবার, পরে কোরো। এখন আমায় স্থিরভাবে পড়তে দাও !"

অতএব ছিটকে ওঠাদের ঝিমিয়ে পড়তে হল !

শশধর আবার উদ্যত হলেন !

"দ্বিতীয়। এক কোটি টাকার অর্ধাংশ ব্যয় হইবে, নানাবিধ দুস্থ প্রতিষ্ঠান ও মানবকল্যাণ সঙ্ঘ কর্তৃক গঠিত প্রতিবন্ধীকল্যাণ সংস্থায় !"

"বাকি অর্ধাংশ—নিম্নলিখিতভাবে বণ্টন হইবে !"

"চার আনা পাইবে আমার একান্ত চিরবিশ্বস্ত সেবক শ্রীনকুড় মহাপাত্র।"

"এবং বাকি চার আনা প্রদান করা হইবে আমার পরলোকগত জ্ঞাতি খুল্লতাত অভয় আদিত্যর পৌত্র শ্রীমান মলয় আদিত্য, প্রলয় আদিত্য, নিলয় আদিত্য ও বিলয় আদিত্যকে।"

"এই খুল্লতাত মহাশয় শৈশবে বাল্যে আমাকে অতীব স্নেহ করিতেন। ...আমার বিদ্যাভ্যাসের প্রতি তাঁহার বিশেষ নজরদারি ছিল। স্কুলে যে প্রতি বছর 'হ্যান্ডরাইটিং'-এ ফার্স্ট হইতাম, সে কেবলমাত্র ওই ছোটকাকার চেষ্টায় ও নিষ্ঠায়।..."

"সে যাক, এইসব স্নেহের ঋণ শোধ হইবার নয়। কেবলমাত্র কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা।"

এরপর ইচ্ছা নং ৩

"এখন বলা হইতেছে বর্তমানে আমার 'নিজস্ব' খাতে খরচ

করিবার জন্য তিনটি ব্যাঙ্কে যে 'কারেন্ট' অ্যাকাউন্ট আছে, তাহা অন্যূন এক লক্ষ মতো হইবে !

"আমার মৃত্যুর পর এই এক লক্ষ টাকা হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করা হইবে আমার পাঁচ পুরুষের ভিটে এই বেনিয়াটোলার জীর্ণ দ্বিতল গৃহখানির সংস্কার সাধনে !

"তা ছাড়া কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় করা হইবে আমাদের বংশের পূর্বপুরুষেরা যে শ্মশানঘাটে দাহ হইয়াছেন, সেই 'কাশী মিত্র ঘাট' শ্মশানের কিছুটা সংস্কার সাধনে ।

"বাকি ত্রিশ হাজার ? তাহা হইতে আমাদের চিরদিনের পুরোহিত ঠাকুর শ্রীভবতারণ ভট্টাচার্য পাইবেন পাঁচ হাজার টাকা ও পাঁচ হাজার পাইবেন আমাদের বাড়ির চিরকালের বামুনদি ঠাকুরানী শ্রীমতী হরিমতি দেবী ।"

"বাকি কুড়ি হাজার ?"

"সেই টাকা দশ হাজার করিয়া পাইবেন আমার যমজ দুই ভাগিনেয় শ্রীমান প্রাণগোপাল রায় ও শ্রীমান মনোগোপাল রায় ।

"যদিও এই ভাগিনেয়দের সহিত আমার কোনও যোগাযোগ নাই ।"

"শৈশবে মাতৃহীন ওই পুত্ররা বাঁকুড়া জেলার কোনও গ্রামে বিমাতার সংসারে পালিত হইয়াছে, শুধু এইটুকুই জানা !"

"তাহাদের নাম দুটি যে এমন নির্ভুল মনে আছে, তাহার কারণ ওই 'যুগলরত্ন' এই বেনিয়াটোলার বাড়িতেই মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে ভূমিষ্ঠ হয় এবং এইখানেই তাহাদের 'মুখেভাত' বা নামকরণ হয় ।"

"দুইটি শিশুকে একই সঙ্গে মুখেভাত দিবার দায়িত্ব মামা হিসাবে আমার উপরেই পড়িয়াছিল ।"

"মনে আছে দুই-দুইটি মুখই একই সঙ্গে হাঁ করিয়া মাছের মুড়া

খাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল।”

“অতএব নিতান্তই নিকট আত্মীয়তা সূত্রে, আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত দুই ভাগিনেয়কে উপহারস্বরূপ নগদ দশ হাজার করিয়া প্রদান করিতেছি।”

“এই ইচ্ছাপত্র সম্পূর্ণ বৈধভাবে রেজিস্ট্রীকৃত ও পাকা দলিল হিসাবে গণ্য হইবে। ইহার আর কোনওরূপ রদবদলের প্রশ্ন নাই!

“সকলে সুখী হউক।”

স্বাক্ষর : শ্রীঅলয় আদিত্য

পাশে সাক্ষীদের স্বাক্ষর ও টিপসহি!

পাঠ শেষে শশধর ঘোষ সেটি গুটিয়ে নিয়ে নিজের ব্যাগে ভরে নিয়ে প্রাণহাঁপানো বন্ধ ঘরখানা থেকে নীচে নেমে এলেন। এ-বাড়ির সবই তাঁর জানা।

সঙ্গে-সঙ্গে নেমে আসে অচু, ভুতু, নকুড়। এবং পুরোহিতমশাই ও বামুনদি।

পুরোহিত মহাশয়ের ব্যস্ততা ঠাকুরঘরে সন্ধ্যারতির সময় হয়ে গেছে বলে। আর বামুনদির ব্যস্ততা রান্নাঘরের জন্য। অনেকক্ষণ রান্নাঘরকে অনাথ করে রেখে গেছেন!

নীচের দালানে তখন টেবিল-চেয়ার পাতা এবং শশধর ঘোষের জন্য রাজকীয় চা-জলখাবারের ব্যবস্থা প্রস্তুত!

শশধর অবশ্য প্রথমে একটু শিহরিত হল। “ওরে বাবা! এত!”

আবার তারিয়ে-তারিয়ে খেতেও থাকেন। ভদ্রলোক খান ভালই!

টেবিলের ধারে অচু দাঁড়িয়ে থাকে খাওয়ার তদারক করতে—

শশধর একটু ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলেন, “ইচ্ছাপত্রের মধ্যে পরিচয় তো পেলাম। তো ওই জগাই-মাধাই দুটি এসে হাজির হলেন কী

করে ?”

অচু একটু হেসে গলার সুর নামিয়ে বলে, “ইয়ে মানে কাকার কাজের সময় তো এদিক-সেদিক থেকে বহু আত্মীয়জন এসেছিলেন ! সকলেই চলে গেছেন। তবে—”

শশধর হেসে বলেন, “এরা আর নড়ছেন না, কেমন ! মহাত্মা দুটি থেকে একটু সাবধান থেকো বাবা ! চোখে-মুখে ধূর্তামির ছাপ !”

“তা তোমরা কবে বম্বে ফিরছ ?”

“এই তো সামনের শুক্রবারে। আর দেরি করা চলে না।”

“সে তো ঠিকই ! চলানোর দরকারও নেই। তা ভুতু তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছে তো ?”

“সে তো নিশ্চয়ই।”

“আর নকুড় ?”

অচু বিনীতভাবে বলে, “নকুড় আর ক'টা দিন থাকবে। এই বাড়িটা মেরামতের ব্যাপারে কন্ট্রাক্টর ঠিক করতে...”

“তা বটে ! তবে ওকেও একটু সাবধানে থাকতে বোলো।”

অচু হাসে, “ওর জন্যে ভাবনা নেই।”

“তা সত্যি ! এক্সপার্ট ছেলে ! তবু সে যাক, তোমাদের যাওয়ার আগে আর-একবার দেখা হবে নিশ্চয় ?”

“সে তো নিশ্চয়।”

শশধর ঘোষ এঁদের চিরকালীন পারিবারিক বন্ধু ; হিতৈষী !

উনি উঠে চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে অচু রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসে।

আসলে, কিছু তো দেয় আছে !

উইল পাঠ-এরও তো একটা পারিশ্রমিক থাকে। সেটা অ্যাটর্নি শঙ্কর মুখার্জিকে সহজেই দেওয়া গেছে। কিন্তু ইনি তো

আপনজনের মতো। তাই সোজাসুজি 'ফি' বলা যায় না! তাই অচু ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে এসে, একটু ইতস্তত করে দু'খানা একশো টাকার নোট বাড়িয়ে ধরে বলে, "ইয়ে আপনার গাড়িভাড়াটা—"

"গাড়িভাড়া?"

হেসে ফেলেন শশধর, "বাড়ি তো এই গলিটা পার করে বড় রাস্তায় পড়লেই। তা যাক, দিচ্ছ যখন; নিই। টাকা মা-লক্ষ্মী। হাতের লক্ষ্মীকে দূরে ঠেলতে নেই।"

বলে নোট দুটি পাট করে বুকপকেটে রেখে হাস্যবদনে গটগটিয়ে গলি পার হয়ে যান!

এর পর অচু একটা শান্তি পেতে নিজের ঘরে এসে বসে।

এখানে 'নিজের ঘর' বলতে আর কী; তবে একতলায় ওই গলির ধারে যে ঘরটায় 'ভুতু' থাকে, তার পাশের একটা ঘরই অচু, সুনীতা নিজেদের বলে বেছে নিয়েছে।

ঘরটার একটা মস্ত সুবিধে—গলি হলেও রাস্তার ধারে মোটা-মোটা লোহার-গরাদে দেওয়া মস্ত-মস্ত দুটো জানলা আছে।

সেখানে এসে বসলেই রাস্তার লোক-চলাচল রিকশার ঠুনঠুন, ফেরিওয়ালার হাঁক ইত্যাদি শুনতে পাওয়া যায়।

এককথায় 'চলমান জীবনের একটি ছবি' চোখে পড়ে। যেটা দোতলার ঘরগুলোয় নেই। দোতলাটা যেন নিরেট পাথুরে।

ছোট-বড়য় খানআষ্টেক ঘর আছে দোতলায়, সেইগুলোই অধিকার করে ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে সংসার করছে—মলয়, প্রলয় নিলয়, বিলয় চার ভাই।

তাদের অত চলমান জীবনের ছবি দেখার জন্য মাথাব্যথা নেই।

তবে এখন আপাতত তাদের এলাকায় দুটি 'গেস্ট'।

বড়দালানে ক্যাম্প খাট বিছিয়ে তারা তাদের দীর্ঘ দেহ বিছিয়ে

মনের আনন্দে কাটাচ্ছে।

তবে আজ ?

ইচ্ছাপত্র পাঠের পর তাদের ভিন্ন মূর্তি।

ভিন্ন মূর্তি অবশ্য ছ-ছটি গাঁট্টাগোঁট্টা জোয়ানের।

সবাই নীচে নেমে গেলেও তারা যায়নি। বরং ঘরের ছিটকিনিগুলো আরও শক্ত করে বন্ধ করে ঘরের মধ্যে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

এটা কী ? দানের ছলে রীতমত অপমান না ?

হতভাগা একটা ভৃত্য নকুড় মহাপাত্র, সে একা চার আনার অধিকারী হল, আর এরা নিজের লোকেরা চারজনে এক আনা করে !

এ তো 'জুতো মেরে গোরু দান !'

ওদিকে জগাই-মাধাই একসঙ্গে ঘোঁত-ঘোঁত করে ওঠে, "তোমরা তো তবু দূরসম্পর্কের জ্ঞাতি। কিন্তু আমরা ? নিজের ভাগনে ! নিজের মায়ের পেটের বোনের ছেলে ! আমাদের সঙ্গে কী ব্যবহার ? পুরুতঠাকুর নগদ পাঁচ হাজার, বামুনদি নগদ পাঁচ হাজার, আর আমাদের কিনা মাত্র দশ হাজার করে ? মুষ্টিভিক্ষা বললেই হয় ! অন্য কেউ হলে নিত না। তবে নেহাত আমাদের অত মান-অভিমান বোধ নেই, তাই চেঁচিয়ে উঠিনি 'নেব না নেব না' করে। তবে এর একটা প্রতিকার করতেই হবে। এত অপমান সহ্য করা যায় না ! রীতিমত অ্যাকশান নেওয়া দরকার।"

যতক্ষণ না রাত্তিরের খাওয়ার ডাক পড়ল, ততক্ষণ ওই ছয়জন ঘরের মধ্যে দাপিয়ে বেড়াতে লাগল।

খাওয়ার ডাক ! বড় মধুর ডাক !

অলয় আদিত্যর কাজের নিয়মভঙ্গের দিনের পর থেকেই তো এলাহি ব্যাপার !

বামুনমাসির ডাক কানে আসতেই সবাই দুদ্দাড়িয়ে নেমে যায়।

আর বাঘা-বাঘা মহিলারা তো আগে থেকেই যে যার সময়ে কাজ সেরে চলেছে। তারা তো এ-ঘরে আসেইনি!

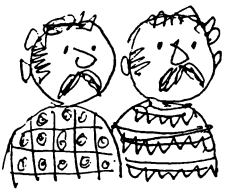

বম্বে চলে আসার পর অচু আর সুনীতা ভুতুকে নিয়ে নিজেদের ফ্ল্যাটের দরজা খুলেই ঢুকল। কাকার ফ্ল্যাট যেমন বন্ধ ছিল, তেমনই বন্ধ রইল।...

নকুড় না আসা পর্যন্ত তাই থাকবে। অবশ্য নকুড় না আসায় অসুবিধে ঢের। তবে কী আর করা যাবে? তাকে যখন একটা কাজের ভার দিয়ে কলকাতায় রাখা হল কিছুদিনের জন্য। যাই হোক ফ্ল্যাটে ঢুকে ঝাড়াপোছা, স্নান ইত্যাদির পর কাছেই একটা গুজরাতি হোটেলে ফোন করায়, তারা খানিক পরেই তিনজনের রাত্রের খাবার সাপ্লাই দিয়ে গেল। অবশ্য উপকরণ সামান্যই। এরা এই ধরনের খাদ্যেই অভ্যস্ত। তবে অলয় মাঝে-মাঝে নকুড়কে অর্ডার করতেন। 'এই নকুড় আজ দিশি রান্না খাওয়াতে হবে। যেমন শাকের ঘণ্ট, কি আলুপোস্ত, কিংবা ধোঁকার ডালনা।' মাঝেমধ্যে এই খাওয়াটা ছিল প্রায় উৎসবতুল্য।...

কিন্তু কলকাতার বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন থেকে এসে, এরা যেন নানারকম খেয়ে-খেয়ে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, বাধ্য হয়ে খেতেই হত। আজ যেন বাঁচল।

খাবার পর শুয়ে পড়ল, অচুরা নিজেদের ঘরে। আর ঠিক পাশের ঘরটাতেই—ভুতু নিজস্ব খাটে।... দু' ঘরের মাঝখানের

দরজায় মোটা পরদা ফেলা।

একটুক্ষণ শোওয়ার পরই ভুতু হঠাৎ ডেকে ওঠে, "দাদা !"

অচু তাড়াতাড়ি চলে এসে বলে, "কী রে ?"

"দাদা ! আমার বড় ভয় করছে।"

"ভয় করছে ? একা শুতে ?"

"ধ্যাত, একা শুতে আবার কী ? ওখানে কি আমি একা শুই না ?"

কথাটা তো সত্যি ! ভুতু তো নীচের ওঁর সেই গলির ধারের ঘরটিতে বরাবর একাই শোয়। তবে তোর বামুনমাসি যাঁর 'ভুতু' অন্ত প্রাণ, তিনি স্বেচ্ছায় ভুতুর ঘরের বাইরে সামনের দালানে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে থাকেন।... বারণ করলেও শোনেন না। বলেন, "ওখানে আমি ভালো থাকি।"...

এ ছাড়াও—ওই বৃহৎ একতলাটার খাঁ-খাঁ করা অবস্থাটায় তো কেউ থাকে না। তাই বামুনমাসি সদরের সামনের শক্ত চলন ঘরটাতে এনে শোওয়ান, তাঁর মেয়ে-জামাই, নাতি-পুতি, এমনকি তাদের বস্তির আরও দু'-পাঁচজনকেও।

অবশ্য, সুবিধে উভয়পক্ষেরই।

তারা যদিও—আগলদার হিসেবে শুতে এলো, তেমনই খোলামেলা হাওয়াদার জায়গাটায় শুয়ে বাঁচল তো !

এই শোয়ার সূত্রেই সকালবেলা বামুনমাসির জামাই এঁদের সকালের মাছ-তরকারির বাজারটা করে দিয়ে যায়। এঁরা বাবুরা তো নড়ে বসতেও ভালোবাসেন না।

এই সূত্রে বামুনমাসির নাতিপুতিক'টাকেও এরা খিদমগারি করিয়ে দেয়। "এই সিগারেট নিয়ে আয়, এই ছাঁচি পানের খিলি নিয়ে আয়। এই বরফ নিয়ে আয়। এই, অমুক দোকানের খাবার

যাচ্ছে !... যেন বুড়ির শরীরে 'নব যৌবনে'র জানলা-দরজায় নতুন সবুজ রং। দেওয়ালের রং গোলাপী।... এমন কী, ভাঙা ঝকঝকে সদর দরজাটা পর্যন্ত ঝাঁ চকচকে।

"তবে বড়দাবাবুগো, সেই যে একজোড়া যুগলমানিক, তেনারা আর নড়ছেন না ! একখানা দিব্যি মস্ত ঘর দখল করে দুই ভাই গেড়ে বসে আছেন। নড়বেন বলে মনে হয় না ! আবার লোককে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলে কী, "আমরা তো ভাগনা, এটা আমাদের খোদ মামার বাড়ি, আমাদের এখানে একটা ঘরে বাস করার অধিকার নেই ?" কেউ বলছে না এ-কথা। তবু বলছে, যাক বাবা। বাড়িখানা দেখে এখন বোধহয় কর্তাবাবুর আত্মা শান্তি পাবেন। "পিতৃপুরুষের ভিটে, পিতৃপুরুষের ভিটে বলে, অস্থির হতেন !"

তারপরই হঠাৎ ডুকরে উঠে বলে, "ও বড়দাবাবুগো। কর্তার ঘরখানা এখন খুলব কেমন করে গো ?"

নকুড় বম্বে ফিরে যাওয়ায়, বেনেটোলার বাড়ির বাবুরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে !

লোকটার কেমন যে মস্তান-মস্তান, গার্জেন-গার্জেন মার্কা ভাব। ওর কাছে নিজেদেরকে যেন হেয় মনে হয়।

তবে ওদের গিন্নিদের অন্য মত। তারা বলে, "কেন বাপু ! লোকটা তো অতি নম্র, ভদ্র, সভ্য। আর কী কাজের ? একটা মানুষ পাঁচটা মানুষের কাজ সামলে তোলে। এই যে বাড়িতে মিস্ত্রি লাগল, কত দিকে কত কাজ। সবই তো নকুড় সামলেছে !"

এরা রেগে বলে, "আচ্ছা বাবা, আচ্ছা, নকুড় আমাদের মাথা কিনে গেছে ! এই যে বাবু, বাহাদুরি করে কন্ট্রাক্টর লাগিয়ে বাড়ি সারিয়ে দিয়ে গেলেন। আমরা দাঁড়িয়ে থেকে মিস্ত্রি খাটিয়ে

সারালে ওর অর্ধেক খরচ হত না ?”

শুনে বউরা রেগে না উঠে পারে না। বলে, “তোমরা ? জন্মে-জীবনে একটা মিস্ত্রি খাটিয়ে বাড়ির গায়ে এক পোঁচ চুন লাগিগেছ ?... এখন বাড়িখানার কী ভোল বদলে গেছে। যেন নতুন বাড়িতে বাস করছি! সারাজীবন তো রান্না ভাঁড়ারঘরে বস্তা-বস্তা ইঁদুর, আরশোলা, উইয়ের ঢিবি নিয়ে কাটিয়েছি। এখন তো মনে হয় স্বর্গসুখে আছি।”

তা যাকগে, গিন্নিদের কথায় কে কান দিতে যাচ্ছে ? নকুড় বিদেয় হয়েছে বাঁচা গেছে।... এখন খোশমেজাজে তাঁর নিন্দেমন্দ করা যায়। তাতেই সুখ।

তবে মজা হচ্ছে, এই একটা বিষয়ে যার কর্তা আর বাড়তি একজোড়া মানিকজোড় এক মত হলেও, হঠাৎ দেখা যাচ্ছে, মানিকজোড়টি কেমন যেন এদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তারা নিজেরাই শুধু দু'জনে ঘরের মধ্যে ফুসফুস গুজগুজ !

আর দুই ভাই হঠাৎ যেন কলকাতা চষে বেড়াচ্ছে। সারাদিন টো টো কোম্পানি !

দাদারা বলে, “হ্যাঁ রে প্রাণগোপাল, মনগোপাল, সারাদিন এত ঘুরিস কোথায় ? রোদে-রোদে ?”

তারা দুই ভাই হঠাৎ তেড়ে উঠে বলে, “কোথায় আবার ? চাকরি খুঁজতে !”

শুনে তো এরা 'থ'।

চাকরি খুঁজতে ? এই বয়সে, আর এই বিদ্যেতে কে তাদের জন্য চাকরি নিয়ে বসে আছে ?

জিজ্ঞেস করলেই তেড়ে ওঠে, “তা যে করেই হোক খুঁজে পেতে হবে। মামার দেওয়া মুষ্টিভিক্ষে ওই দশ হাজার টাকায় তো জীবন কাটবে না !”

তবে আর কে কী বলবে ?

তবে চাকরি খোঁজার জায়গাটা যেন তাদের কোর্ট-কাছারির দিকে।

প্রায়-প্রায়ই লোকে বলে, "ওদের দুই ভাইকে আলিপুর কোর্টের কাছে বটতলায় বসে থাকতে !"... "ওদের দুই ভাইকে শেয়ালদা কোর্টের চত্বরে ঘোরাঘুরি করতে।"

জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না।

দুই ভাই-ই হঠাৎ এমন খেঁকি হয়ে উঠেছে !

এমনকী এত খেঁকি যে, বামুনদি যখন একদিন সন্ধ্যেবেলা জিজ্ঞেস করেন, "হ্যাঁ বাবা মনু, প্রাণগোপালকে আজ সন্ধেবেলা খেতে বসতে দেখলুম না ?"

তখন মনু খেঁচিয়ে উঠে বলে, "তার সর্দিজ্বর হয়েছে। ঘরে শুয়ে আছে।"

"ওমা তাই বুঝি ? সর্দিজ্বরে কিছু খাবে না ? দু'খানা গরম পরোটা ভেজে দিতাম।"

"না, না, ওসব পরোটা-ফরোটায় দরকার নেই। ওর ওই ধাত। দু'দিন উপোস করে বিছানায় পড়ে থাকলেই ঠিক হয়ে

যাবে।

তো তাই থাকে।

দু' দিন কেন, দিন তিন-চার না খেয়েদেয়ে বিছানায় পড়ে থাকে। ঘর থেকে বেরোয় না। কেউ তাকে চক্ষেও দেখতে পায় না।

অবশেষে দিন চারেক পরে আবার উঠে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল প্রাণগোপালকে।

তবে আশ্চর্য! চেহারায় না জ্বরের, না উপোসের ছাপ! দিব্যি তাজা।

তা ওই বোধহয় ওর ধাত!

তবে একটা জিনিস দেখা গেল, সারাদিন চাকরি খুঁজে বেড়ানোটা যেন কমেছে।

দুই ভাই সর্বদা ঘরের মধ্যে!

আর কী যেন পরামর্শ!

টুম্পার খেলাঘরের সংসারে নেই হেন জিনিস নেই।..

যখন যেখানে কিছু কুড়িয়ে পায়, রাংতা, সোনালি ফিতে, এটা-সেটা সব এনে সংসার ভরায়।...

তবে একটা বিশেষ প্রিয় জিনিস আছে সেটা হচ্ছে ট্রাম-বাসের টিকিট।...

একটা মরচে-পড়া টিনের কৌটোর মধ্যে সে টিকিট জমায়।

যদিও এ-বাড়িতে কে আর কত বাসে-ট্রামে চড়ে? সবাই তো কুঁড়ের বাদশা। তবে সম্প্রতি প্রাণগোপাল, মনগোপালের চাকরি খুঁজে বেড়াবার দৌলতে, বেশ কিছু টিকিট জমেছে টুম্পার! টুম্পার তো ভয়ডরের বালাই নেই। যখনই সুবিধে পায়, তার 'কাকু'-দের পকেট হাঁটকে, টিকিট উদ্ধার করে আনে।

আজ টুম্পা মনের আনন্দে তার টিকিটের সংগ্রহশালাটি

বিছানায় বিছিয়ে গুনছিল। টুম্পার মা হঠাৎ সেদিকে তাকিয়ে বলে, "এ টিকিট দুটো কোথায় পেলি রে? এ তো দেখছি রেলগাড়ির টিকিট!"

টুম্পা আঁ আঁ করে ওঠে! "ওই দুটো আমার ভাল টিকিট!"

"তা তো বুঝলাম। কিন্তু পেলি কোথায়?"

"ভোঁদকাকাকুর পকেট থেকে!"

ভোঁদকাকাকু মানে প্রাণগোপাল।

টুম্পার মা অবাক হয়ে বলেন, "তিনি তো তিন-চার দিন বিছানায় শুয়ে ছিলেন হঠাৎ তাঁর পকেটে রেলগাড়ির টিকিট। পুরনোও তো মনে হচ্ছে না।"

টুম্পার বাবার কাছে এসে বলে, "আচ্ছা এটা কী ব্যাপার বলো তো? বেনারসে যাওয়া-আসার দু'খানা টিকিট। প্রাণগোপাল ঠাকুরপোর পকেট থেকে নিয়ে এসেছে টুম্পা।"

টুম্পার বাবাও দেখে তাজ্জব!

যে মানুষ চারদিন বিছানায় পড়েছিল, হঠাৎ তার পকেটে রেলগাড়ির টিকিট!

চার ভাইয়ে চিন্তায় যোগ দেয়!

"ব্যাপারটা তো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না! একটা অদ্ভুত রহস্য।"

"জিজ্ঞেস করে দেখবে?"

"ওরে সর্বনাশ।"

সর্বদা তো আগুন হয়ে আছে।

"জিজ্ঞেস করতে গেলে তেড়ে মারতে আসবে না?"

"কেন?"

"তা কে জানে?"

"কিন্তু রহস্যটা উদ্‌ঘাটন হবে কী করে?"

মলয়, প্রলয়, নিলয়, বিলয় নেহাত সাদামাটা চারটে মাথা, মাথা ঘামিয়ে-ঘামিয়ে হদিস পায় না !

এইভাবে দিনগুলো চলছিল যেন থমথমিয়ে। হঠাৎ একদিন এক অভাবিত ঘটনা।

বারাণসী কোর্ট থেকে শ্রীপ্রাণগোপাল রায় ও শ্রীমনগোপাল রায়ের নামে 'সিল' করা একখানি দলিল এসে হাজির।

এ আবার কী ? কী ব্যাপার ?

যাই হোক খুলতে তো হল, আর খুলে দেখে সবাই হাঁ।

একখানি দানপত্রের দলিল। রীতিমত উপযুক্ত স্ট্যাম্প মারা ডিড পেপারে ছাপা সেই দানপত্রের ভাষা এই, "আমি শ্রীমতী নিত্যলীলা দেবী সম্প্রতি আমার মৃত ভ্রাতুষ্পুত্র অলয় আদিত্যর ইচ্ছাপত্র সূত্রে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ লাভ করিয়াছি, সেই অর্থ আমি বাঁকুড়া ব্যাদড়াপাড়া নিবাসী শ্রীসত্যগোপাল রায়ের যমজপুত্র শ্রীমান প্রাণগোপাল রায় ও শ্রীমান মনগোপাল রায়কে সম পরিমাণে ভাগ করিয়া দিয়া এই দানপত্র রচনা করিতেছি। যেহেতু আমি আশ্রমবাসিনী সন্ন্যাসিনী, আমার কাছে, টাকা মাটি, মাটি টাকা। সেই হেতুই আমি ওই দুস্থ আত্মীয়দের টাকাগুলি দান করিলাম। যদি ভবিষ্যতে ওই অর্থ হইতে তাহাদের জীবন সুখের হয়।"

স্বাক্ষর : শ্রীমতী নিত্যলীলা দেবী...

ঠিকানা : বারাণসী, গুরুধাম, শান্তি কুটির।"

এই দানপত্র দেখে মলয়, প্রলয়, নিলয়, বিলয়ের চার জোড়া চোখ থেকে মুঠো-মুঠো আগুন ছিটকোয়।

"এর মানে? পিসদিদা তাঁর সর্বস্ব দানপত্র করে দিয়েছেন তোদের? তোরা কে?"

যুগলরত্ন দুই ভ্রাতা বলে ওঠে, "তা আমাদের ওপর চোখ গরম করছ কেন? তোমরাও যেখানে, আমরাও সেখানে। আমরা তো গিয়ে তাঁর পায়ে ধরে সাধতে যাইনি, দাও-দাও বলে!"

যুক্তিটা অকাট্য। সত্যিই তো, এরাও যেখানে, ওরাও সেখানে।

দুমদুমিয়ে পায়চারি করতে-করতে হঠাৎ প্রলয় বলে ওঠে, "এ দানপত্র জাল। আইনে চলবে না।"

প্রাণগোপাল, মনগোপাল হতাশভাবে বলে ওঠে, "জাল? আইনে চলবে না? তবে আর কী করার আছে? গরিব ছিলুম, চিরকাল গরিবই থাকব।... তবে 'জাল' তার প্রমাণ কী?"

এই যে নাম-স্বাক্ষর। দেখছিস? শ্রীমতী নেত্যলীলা দেবী। নিত্যলীলা নয়। নেত্যলীলা।"

প্রাণগোপাল একটু চুপসে গিয়ে বলে, "বয়সের দোষে হাত কাঁপার ফলে হ্রস্ব ই-টা 'এ-কার'-এর মতো হয়ে যেতে পারে, তবে কথা হচ্ছে, কাশীতে আমার কে এমন ইয়ার-বন্ধু আছে যে, এত টাকা খরচা করে একখানা জাল দলিল পাঠিয়ে মজা দেখবে? এসব বানাতে আর পাঠাতে খরচ তো নেহাত কম হয়নি!"

তাও তো বটে!

অতএব সবাই চুপ।

প্রাণগোপাল, মনগোপাল দুই ভাই আপন মনে বলে ওঠে, "যাকগে, জাল হলে জাল। তবে এসেছে যখন একবার কালীঘাটে

পুজো দিয়ে আসি।"

অতএব বেশ ঘটা করে পুজো দিয়ে আসে।

তারপর বলে ওঠে, "যাই বাঁকড়োয় গিয়ে একবার বাবাকে সুখবরটা দিয়ে আসি। আর ওখানকার সদাজাগ্রত কালী রক্ষাকালীর মন্দিরে পুজো দিয়ে আসি। পরে যদি দেখা যায় সব ফোক্কা, তা হলে 'পুনর্মূষিক'।"

দুই ভাই চলে গেল বাঁকুড়ায়।

হঠাৎ এই সময় এক সাঙ্ঘাতিক দুঃসংবাদ, যা ভাবনার বাইরে ছিল!

দুঃসংবাদটা অবশ্য বম্বেতে অচুর কাছেই পৌঁছেছিল, তার মাধ্যমেই টেলিফোনে বেনেটোলায় এসে পৌঁছল।

বম্বের টেলিগ্রাম এসেছে, গত পরশু রাত্রে নিত্যলীলা দেবী ঘুমের মধ্যে হার্টফেল করে মারা গেছেন।

ডাক্তারদের মত, ঘুমের মধ্যে কোনও আততায়ীর হাতে আক্রান্ত হয়ে আতঙ্কে এই মৃত্যু ঘটেছে। কারণ দেখা যাচ্ছে মৃত্যুর আগে বেশ ধস্তাধস্তি কাণ্ড ঘটেছে!

বিছানা বিধ্বস্ত! এবং মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে মারা গেছেন।...

তাঁর হাতের মুঠোয় একগোছা চুল! মনে হয় আততায়ীর চুলের মুঠি এত জোরে টেনে ধরেছিলেন যে, সেই চুলের গোছা তাঁর হাতের মুঠোয় উপড়ে এসেছে। তাঁর খাবার জলের পলিথিনের বোতলটাও ঘরের মেজেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে।

এই ভয়ঙ্কর খবরে বম্বে-বেনেটোলায় দু' জায়গাতেই গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। সেই চিরকালের ধর্মপ্রাণা মহিলার কিনা এই শোচনীয় মৃত্যু!...

কিন্তু টেলিগ্রামটা যে কে করেছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

সাধারণত টেলিগ্রাম আসে ইংরেজিতে, এখানা আবার হিন্দিতে।

অবশ্য হিন্দি হল গিয়ে রাষ্ট্রভাষা। সবেতেই চলে। তবে মনে হচ্ছে টেলিগ্রাম প্রেরক একটু অল্পশিক্ষিত লোক। বোধ হয় বারাণসী আশ্রমের কোনও কর্মচারী হতে পারে! মৃত্যুর তারিখটাও যেন কেমন অস্পষ্ট!... তবে পরদিনই আবার একখানি সেই হিন্দিতে টেলিগ্রাম। "জানানো হচ্ছে অদ্য প্রাতে নিত্যলীলা দেবীর মরদেহখানি আশ্রমের মহারাজজিরা বারাণসীর পুণ্য স্থান মণিকর্ণিকা ঘাটে যথোপযুক্তভাবে সৎকার করে এসেছেন।"

এর পর আর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন আসে কোথায়?

শোকের সাগরে ভাসতে থাকে আদিত্য পরিবার।

যুগল রত্ন বাঁকুড়া থেকে ফিরে এসে এই দুঃসংবাদ শুনে বুক চাপড়াতে থাকে। "হায়, হায় আমাদের কপাল! ওই টাকার কাঁড়ি দান করে গেলেন আমাদের। আমরা একবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে আসতে পেলাম না।"

না পেলে আর কী করা যাবে! এখন তো আর তাঁর পা ছুঁতে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

সময়ে সবই সয়ে যায়।

আবার সকলের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরে আসে। বম্বেতে অচু, ভুতু, সুনীতা, নকুড়ের যেমন দিন চলছে, তাই চলতে থাকে।

আর বেনেটোলার বাড়িতে, আবার খাওয়া, মাথার ঘটা চলতে থাকে।

তো এদিন সন্ধ্যার মুখে দালান জুড়ে সকলের সন্ধ্যার চা-জলখাবারের আয়োজন হয়েছে। পাতাগুলো পড়েছে, তখনও খাবার সাপ্লাই হয়নি, হঠাৎ বেনেটোলার বাড়ির সেই পেটেন্ট সদর দরজার লোহার কড়াটা ঝনঝনিয়ে উঠল।

এ সময়ে কে ?

কে জানে কে খাওয়ায় ডিস্টার্বড করতে এসেছে।

ছোট ছেলেরা ধারেকাছে কেউ নেই যে পা উঁচু করে খিল খুলতে যাবে। প্রাণগোপাল ছিল সামনের দিকে। সে উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে ধরে।

আর সঙ্গে-সঙ্গে পিছু হটতে-হটতে আর আঁ-আঁ করতে-করতে, ধড়াস করে পড়ে গিয়ে বিরাট দেহখানা নিয়ে 'গোঁ গোঁ করতে থাকে।

তা করবে না ?

দরজা খোলামাত্রই যদি দেখতে পায়—কালো আলখাল্লা পরা, লম্বা-লম্বা কালো জটা, ভুষোমাখা কালো মুখে বড়-বড় চুনের ফোঁটা দাগা এক ভয়ঙ্করী মূর্তি এক হাতে একটা জলের বোতল, আর এক হাতে পলিথিনের প্যাকেটে ভরা একমুঠো চুল নাচাতে-নাচাতে ঢুকে আসে বিকট গলায় বলতে-বলতে, "হাউ মাউ খাঁউ, মনিষ্যির গন্ধ পাঁউ, একটা খাব, দুটো খাব, কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাব।"

তো গোঁ-গোঁ করতে-করতে অজ্ঞান হয়ে পড়বে না ?

বাকি যারা বসে ছিল, তারাও তো একনজর দেখেই দু' হাতে মুখ ঢেকে গোঁ-গোঁ শুরু করেছে !

হঠাৎ শুনতে পায় কে যেন বলে উঠল, "আর থাক, অনেকক্ষণ তো মুর্ছো গিয়ে পড়ে থাকা হয়েছে বাছাধনের। বলি—চিনতে পারছিস এ চুল কার ? এ বোতল কোথাকার ?"

এ কী ?

এ কণ্ঠস্বর কার ? ও তো সেই বিকট স্বর নয় ! যেন বেশ পরিচিত।

সাবধানে একটু চোখ খুলে দেখে, সামনে থেকে সেই ভয়ঙ্করী

মূর্তি অন্তর্হিত !

সামনে দাঁড়িয়ে গেরুয়া থান পরা ন্যাড়ামাথা কাঁধে ঝোলা পিসদিদা।

সবাই আহ্লাদে আর্তনাদ করে ওঠে, "পিসদিদা আপনি বেঁচে আছেন ?"

"দেখে কী মনে হচ্ছে ? আছি, না নেই ? তবে হ্যাঁ, এই লক্ষ্মীছাড়া পাষণ্ড দুটো 'নেই' করে দেওয়ার তালে ছিল। কলকাতা থেকে ঠেলে গিয়ে কাশীধামের গুরুআশ্রমে শান্তি কুটিরে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে থাকা বুড়িকে ভূত সেজে ভয় দেখিয়ে, গলা টিপে ধরে ধস্তাধস্তি করে জাল দলিলে সই করিয়ে নিয়ে যায় পাজিরা। তবে নেহাত নাকি শক্ত পাল্লায় পড়েছিল, তাই ! বলি এ চুলের গোছা কার ?"

ঝোলা থেকে সেই চুলের গোছাটা বের করে আবার দোলাতে থাকেন তিনি। বুড়ির হাতে উপড়ে এসেছিল ধস্তাধস্তিতে।

চুলের গোছা !

হঠাৎ প্রাণগোপাল নিজের ঘাড়ে হাত বোলায়।

অ্যাঁই, এ কী !

সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে, চিরকাল প্রাণগোপালের ঘাড়ের ওপর দুল দুলনো যে চুলের গোছাটিকে, সযত্নে ঘাড় থেকে উলটে এনে মাথার মাঝখানের তেলচুকচুকে টাকের ওপর টেরির বাহার করত, সেই চুলের গোছা সমূলে উৎপাটিত। ঘাড়ে সে জায়গায় লাল-লাল ফোসকা।

অবাক কাণ্ড তো ! কবে কখন এমন কাণ্ড হল, কারও তো লক্ষ পড়েনি।

তা এমন কত কী-ই যে রোজ দেখেও লক্ষ পড়ে না লোকের !

চুলের গোছাটা ফের ঝোলায় পুরে বোতলটা আর একবার বের

করেন নিত্যলীলা দেবী। বলে ওঠেন, "এততেও সাধ মেটেনি বাছাধনদের। বুড়ি মরে গড়াগড়ি দিতে দেখেও তার খাবার জলের বোতলে বিষের পুরিয়া মিশোলেন আর এক মহাত্মা!...এই দুটি মোক্ষম সাক্ষী। এখন চলো বাপধনেরা পুলিশে। দ্যাখো, তোমাদের কপালে কী আছে, জেল কারাদণ্ড যাবজ্জীবন ফাঁসি!"

"আঁ। আঁ। আঁ। পুলিশে নয় গো!"

"কেন? নয়গো কেন? মাঝরাত্তিরে বুড়ির গলা টিপে ধরে জাল দলিলে সই করিয়ে নেওয়ার চেষ্টার সময় মনে পড়েনি? জগতে পুলিশ আছে, জেল আছে, ফাঁসি আছে?"

"ওরে বাবা রে, আর কখনও এমন কাজ করব না। এই নাক মুলছি। কান মুলছি।"

পিসদিদার বজ্র স্বর, "ঠিক? মনে থাকবে, মনে পড়বে, লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। যাক, এবারকার মতো তা হলে মাফ করে দিলাম। তবে দে, মেপে সাত হাত নাকে খত দে।"

বলা মাত্র দুই জোয়ান উপুড় হয়ে পড়ে নাকে খত দিতে থাকে। ঘষতে ঘষতে নাকের ডগায় রক্ত ফুটে ওঠে।...

এই পুরনো বাড়ির আর সব নতুন হয়ে গেলেও ওই দালানের মেঝেটা সাবেকি কাদাখোঁচা এবড়ো-খেবড়োই আছে!

নাকের অবস্থা দেখে, নিত্যলীলা দেবী দয়ার গলায় বলেন, "থাক থাক হয়েছে। জন্মের শোধ নাকের ডগায় ঘাঁটা পড়ে রইল। আরশিতে মুখ দেখতে গেলেই মনে পড়বে... যাক, একের পাপে অন্যের দণ্ড। তোরা সব খেতে বসেছিলি বাছারা, নে, নে, খেয়ে নে! ভাল করে খা। ওই লক্ষ্মীছাড়া দুটোও গিলতে বসুক।"

"চলি।"

"চলি! অ্যাঁ। এক্ষুনি চলি?"

"তা চলব না তো থাকতে এসেছি? এসেছিলাম একবার পাষণ্ড, পাতকী দুটোকে শিক্ষা দিতে।"

বলে কাঁধের ঝোলা কাঁধে তুলে, ব্রাউনরঙা কেড্‌স জোড়ায় পা ঢুকিয়ে চলে যান গটগটিয়ে।

খোলা দরজাটার দিকে সকলে হতভম্ব হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকে, যতক্ষণ দেখা যায়।

কারও খেয়াল হয় না সেই সারি-সারি সাজানো পাতে ততক্ষণে ফুলকো লুচি আর বেগুনভাজা সাপ্লাই হয়েছে।

এ কী ঘটল? সত্যি, না স্বপ্ন!

কিন্তু লুচি, বেগুনভাজাগুলো তো স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে না! সুখময় ভুরভুর গন্ধটি তো নাকে আসছে।

এবার আর খবরটা বম্বে থেকে বেনেটোলায় নয়। বেনেটোলা থেকে বম্বের। এখান থেকে টেলিফোন যায়, পিসদিদার মৃত্যুসংবাদটা মিথ্যে! তিনি জলজ্যান্ত বেঁচে আছেন। এবং নিজে এসে একদিন দেখা করে গেছেন। শুনে সাগরিকা কুঞ্জে আহ্লাদের বান বয়। আর সঙ্গে-সঙ্গেই অচু বারাণসী গুরুধাম শান্তি কুটিরে এসে হাজির হয়।

"পিসদিদা। এর মানে?"

"মানে বোঝাতে গেলে মহাভারত ভাই!"

"কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না হঠাৎ ওই মিথ্যে মৃত্যুসংবাদটা পাঠাল কে?"

পিসদিদা একটু হেসে বলেন, "ভেবে পাচ্ছিস না ? তা হলে বলি, পাঠিয়েছিল এই বুড়িই।"

"অ্যাঁ। সে কী ! কারণ !"

"কারণ বলতে গেলে অনেক কথা। তবে এইটুকু বলে নিই, ওই মিথ্যে সংবাদটি বুদ্ধি করে যথাসময়ে পাঠিয়ে মায় বুড়িকে একেবারে মণিকর্ণিকা ঘাটে সৎকার করিয়ে বিরোধীপক্ষকে নিশ্চিত করে ফেলায়। তোদের আর সত্যি মৃত্যুসংবাদটা শুনতে হল না। ...তারা ভেবে নিল অ্যাকশান সাকসেসফুল। তবে ইংরিজি বিদ্যে তো নেই, তাই হিন্দিতে টেলিগ্রাম। তা যাক, রাষ্ট্রভাষা তো, এতেই কাজ চলল !"

তবু অচুর মাথা থেকে ধাঁধা যাবে না। তাই নিত্যলীলা দেবীর হাসি-হাসি মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

নিত্যলীলা দেবী বলেন, "ধাঁধা লাগছে ? কেমন ? ধাঁধার উত্তর পাবি পরে, যখন দুই মাণিকজোড়ের কীর্তিকলাপের সব খবর পাবি।...পাবিই তো। তবে আজ তুই এসে গেছিস খুব ভাল হল। ভাবছিলাম কালই হরিদ্বার আশ্রমে চলে যাব। বড় মহারাজের সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে।....আমার চিরকালের আদরের ভাইপো অলয় যখন পিসিকে অত টাকা দিয়ে গেল, সেই টাকায় যদি 'গোমুখী গঙ্গোত্রী'-র মতো দুর্গম পথের যাত্রীদের জন্যে কালীকমলীওয়ালার ধর্মশালার মতো ছোটখাটো একটু কিছু করা যায় !...অবশ্য এসব কাজে কোটি টাকা কিছুই নয়। কোটি-কোটি টাকা নস্যি। তবু যতটুকু যা করা যায় তার চেষ্টা। ...যাকগে আজ তুই এখানে এসে পড়েছিস, এখানের 'ভোগের প্রসাদ' খেয়ে যা। কখনও তো আসিস না।"

অচু বলে, "পিসদিদা, আবার কবে দেখা হবে ?"

"তা কী বলা যায় ভাই ? হয়তো হবে, হয়তো হবে না...ওই

ভোগ হয়ে গেল। ঘন্টা শোনা যাচ্ছে। চল।...তবে এইটুকু বলে রাখি অচু, ওই যে মাণিকজোড় একটি তোদের আদিত্য বাড়িতে মামার বাড়ির আবদার নিয়ে গেড়ে বসে আছে, পারিস যদি তো তাদের ওখান থেকে উচ্ছেদ করিস, ও দুটি হচ্ছে শয়তানের ঝাড়। কখন যে আদিত্য বাড়ির কার কী অনিষ্ট করে বসে, কে জানে!

তা বলতে কী, উচ্ছেদ করা সম্ভব হল। কারণ সম্প্রতি নাকের ডগায় ঘাঁটা পড়িয়ে বসার ফলে, দাপটটা একটু চুপসে গেছে তাদের!

তারপর?

তারপর আর নতুন কিছু না।

নিত্যলীলা দেবীর ধর্মশালার আয়োজন হতে চলল!

এদিকে সাগরিকা কুঞ্জে অচু, ভুতু, সুনীতা আর নকুড়ের যেমন চলে আসছিল, তেমনই চলতে থাকে।

আর বেনেটোলার বাড়ির বাবুদের যেমন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খাওয়ার সাধনা চলত, তেমনই চলতে থাকে।

বরং এখন একটু বেশিমাত্রাতেই হতে থাকে, আর্থিক সুসার হওয়ায়।

অলয় আদিত্যর ইচ্ছাপত্রে কোনও রহস্য ছিল না। নেহাত সাদামাঠাই। শুধু দুটো দুষ্টুবুদ্ধি শয়তানের লোভ আর ঈর্ষার ফলে, অদ্ভুত একটা রহস্যজাল সৃষ্টি করে, এত কাণ্ড ঘটিয়েছিল। এমনকী, একটা মৃত্যুও ঘটাতে বসেছিল। নেহাত একটি শক্ত পাল্লায় পড়ায় সেটি আর হয়ে ওঠেনি।

যাক, সব ভাল যার শেষ ভাল।

এখন যথাপূর্বং তথা পরং।

আশা করা যায়, অলয় আদিত্যর আত্মাও হয়তো এখন কোনও একখানে। তাঁর প্রিয় পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করছেন।